তবু একলব্য

TABU EKOLABYA
ISSN 0976-9463

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

ইউ.জি.সি. অনুমোদিত জার্নাল, সূচক নম্বর ৪২৩১৮

TABU EKOLABYA

An International peer reviewed Research Journal on
Language, Literature & Human Sciences
UGC Approved Journal No. 42318

১৩ বর্ষ • ২০১৮
জানুয়ারি - জুন সংখ্যা

গীতিকা বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
(রেজিস্ট্রেশন নং S/I.L/34421/2005-06)
-এর অন্তর্গত একটি গবেষণা পত্রিকা

TABU EKOLABYA

An International peer reviewed Research Journal on Language
Literature & Human Sciences.

ISSUE : 13, Vol. 33, January-July 2018

ISSN : 0976-9463

TABU EKOLABYA
An International peer reviewed Research Journal on Language
Literature & Human Sciences.

Chief Editor : Dipankar Mallik

Executive Editor : Debarati Mallik & Tapas Pal.

Printed & Published by *Debarati Mallik* on behalf of
TABU EKOLABYA, Kolkata- 700009, West Bengal, India.
Contact No. : 9836733383 / 9836733393
e-mail : tabuekalabya@gmail.com
facebook : Tabu Ekalabya
Website : www.gouriculture.com

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতা বাহার।

মূল্য ৩২৫ টাকা

সভাপতি

বিপ্লব মাজী
কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সাহিত্য
সমালোচক

মুখ্য উপদেষ্টা

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

রামকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন আঞ্চলিক সচিব, সাহিত্য
আকাডেমি, পূর্বাঞ্চল শাখা এবং
প্রাক্তন অধিকর্তা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

সম্পাদক

দীপঙ্কর মল্লিক
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
আহ্বায়ক : এম.ফিল ও পিএইচ. ডি কোর্স, স্বামী
বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার

যুগ্ম সম্পাদক

ড. তপন মণ্ডল
প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ,
ডায়মণ্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

কার্যকরী সম্পাদক

দেবারতি মল্লিক
পিএইচ. ডি গবেষক, বাংলা
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
আমন্ত্রিত অধ্যাপক : মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ, বিরাটি,
পি.জি. বাংলা
চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা, পি.জি. বাংলা

তাপস পাল
পিএইচ. ডি গবেষক, বাংলা
স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার

সহ-সম্পাদক

দিব্যেন্দু পালধি
গ্রন্থন বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আহ্বায়ক

রামকৃষ্ণ মণ্ডল
প্রশাসনিক সদস্য, প্লেসমেন্ট সেল, রামকৃষ্ণ মিশন
বিদ্যামন্দির এবং সহকারী সমন্বয় সাধক, স্বামী বিবেকানন্দ
রিসার্চ সেন্টার

উপদেষ্টামণ্ডলী : অধ্যাপক ও গবেষক

ড. পবিত্র সরকার
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সুমিতা চক্রবর্তী
প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ড. তপোধীর ভট্টাচার্য
প্রাক্তন উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী
প্রাক্তন প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন প্রফেসর ও কলাধ্যক্ষ : কলা ও বাণিজ্য বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. ব্রততী চক্রবর্তী
প্রাক্তন প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ,
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ড. হাবিব আর রহমান
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়,
কুষ্টিয়া, ঢাকা

ড. বারিদ বরণ ঘোষ
প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টামণ্ডলী : কবি ও লেখক

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, বাংলাদেশ

ইয়াং জংজে
কবি এবং অনুবাদক, চিন

জ্যামি প্রোক্টর-খু, আমেরিকা
কবি ও অনুবাদক

ট্রান্ কোয়াঙ কুই
সহ সভাপতি, ভিয়েতনাম লেখক সংঘ

জারকো মিলেনিক
লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক, ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন,
বসনিয়া-ক্রোশিয়া

সমীর রক্ষিত
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

অমর মিত্র
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

সাধন চট্টোপাধ্যায়
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

জয়া মিত্র
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

শুভময় মণ্ডল
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সত্যবতী গিরি
প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শহীদ ইকবাল
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদক : 'চিহ্ন' পত্রিকা

ড. সোনালি মুখার্জি
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ ও কলাধ্যক্ষ,
কলা ও বাণিজ্য বিভাগ
সিধো-কানু বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. উদয়চাঁদ দাশ
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রেজাউল করিম
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ ও কলাধ্যক্ষ
কলা ও বাণিজ্য বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ড. হোসনে আরা জলি
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ড. বরেন্দু মণ্ডল
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্যামাচরণ মণ্ডল
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
চারুচন্দ্র কলেজ

ড. বিদিশা সিনহা
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
স্কটিশচার্চ কলেজ

ড. রাধেশ্যাম সাহা
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ

ড. সুব্রত ঘোষ
বিভাগীয় প্রধান, পি.জি, বাংলা বিভাগ
হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ

শ্রী স্বপন কুমার আশ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফকিরচাঁদ কলেজ

শ্রী সুবীর সেন
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়

শ্রী প্রিয়ব্রত ঘোষাল
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

ড. শুভঙ্কর রায়
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

ড. অর্ণব সাধুখাঁ
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

শ্রী প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

কার্যকরী কমিটি

পুষ্পেন্দু মজুমদার
রুদ্রপুর রাধাবল্লভ উচ্চবিদ্যালয়

দীপক কুমার ঘোষ
রামনগর নুট বিহারী পাল চৌধুরী
হাই স্কুল

অরুণাভ চক্রবর্তী
কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির

মধুসূদন সাহা
আমন্ত্রিত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

বাপ্পা প্রামাণিক
সুস্মিতা মণ্ডল
প্রিয়া রায়

কৃতজ্ঞতা

ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও
বঙ্কিম-রবীন্দ্র গবেষক
সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

ড. অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ

ড. মিতালী গঙ্গোপাধ্যায়
কো-অর্ডিনেটর, আই.কিউ.এ.সি
মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপিঠ

সুশীল সাহা
সম্পাদক, প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ

সম্পাদকীয়

একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। তা নিয়ে পরিবারের প্রত্যেকের চিন্তার শেষ নেই। টাকা-পয়সা নেই। খাওয়ানোর কিছু নেই। অলংকার দেওয়ার মতো সামর্থ্য নেই। বরের পণ মেটানোর কিছু নেই। সংগতই মেয়ের বাবার চিন্তার শেষ নেই। অথচ নিত্য প্রতিবেশির আনাগোনা। বিয়ের ফর্দ নিয়ে তাঁদের চিন্তার শেষ নেই। বিশেষ করে খাওয়ার মেনু কী কী হচ্ছে তার লিস্ট নিয়ে প্রতিবেশিদের উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

কিন্তু মেয়ের বাবা নিরুপায়। এদিকে বরের বাড়ি থেকে নিত্য ফোন আসে। অলংকারের সোনা যেন খাঁটি হয়। বরযাত্রীদের খাওয়ানো যেন ঠিকমতো হয়। বরযাত্রীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অলংকার ও অন্যান্য খাট-বিছানাপত্রের দামও বাড়তে থাকে। মেয়ের বাবার দু'চোখ ভরে জল আসে। প্রতিবেশিরা গামছা নিয়ে আসেন। তারা নিত্য হায় হায় করে। কিন্তু জানতে চায় না, মেয়ের বাবা কেন কাঁদছে? এদিকে ছেলে খবর পাঠায়, তার গাড়ির অবস্থা ভালো নয়। মেয়ের বাবাকে একটা গাড়িও দিতে হবে।

সম্পাদক যেন অসহায় এক মেয়ের বাবা। পত্রিকা চালানোর দায় তাঁর। পেপার কেনা, প্রেস দেখা, লেখা জোগাড় করা, প্রুফ দেখা, প্রচ্ছদ করা, বারবার লেখা কারেকশন করা—এসব দায়িত্ব তাঁরই। সবার মুক্তি আছে—সম্পাদকের মুক্তি নেই। কেননা, মেয়েকে বিয়ে না দিলে উপায় নেই। এদিকে সৎপাত্র প্রায়ই খবর নেয়, মেয়ে কেমন আছে? অর্থাৎ লেখা বের হতে আর কত দেরি? বরযাত্রীরা দাঁড়িয়ে থাকেন খাবারের আয়োজন কেমন হল? অর্থাৎ পত্রিকার পৃষ্ঠা কেমন? তা দেখবার অপেক্ষায়। সমালোচকরা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, পত্রিকার বানান ভুল কত!

১.

পত্রিকা প্রকাশ করা আর রুগ্ন মায়ের সন্তান প্রসব করা যেন সমান দায়। সন্তান প্রদানে ব্যর্থ মা আর পত্রিকা প্রকাশে ব্যর্থ সম্পাদক— দুই-ই যেন সমান অপরাধী। কিন্তু সম্পাদকের সঙ্গে এগিয়ে এসে পত্রিকা-পরিবার গঠন করার দায় কার?

২.

সম্পাদক যদি সবদিক থেকে খাঁটো হন, তাহলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। ফলে বৈষ্ণবের মাধুকরী বৃত্তি করতে হয় সবার কাছে। কিন্তু চারিপাশে এত বৈষ্ণব, সব বৈষ্ণবের ঝুলি ভিক্ষার চালে ভরে ওঠে না।

৩.

একসময়ে দিন-ক্ষণ-তিথি মেনে সব লেখা পাওয়া যায় না। ফলে সম্পাদককে প্রথম দেওয়া লেখকের পরশুরাম-মেজাজের কুঠার-বাক্য শ্রবণে ক্ষত্রিয় ধ্বংস হওয়ার মতো অবস্থাপ্রাপ্ত হতে হয়।

৪.

তবু বেঁচে থাকার প্রগাঢ় ইচ্ছে নিয়ে জীবনানন্দের সেই মেঠো ইঁদুরের মতো দৌড়াতে হয় সম্পাদককে। অবশ্য দিনান্তে এই বিশ্বাস লালন করতে হয়, লালনের মতো তাঁর এই সন্তানও একদিন মনের মানুষকে মনের মাঝে প্রকাশ হতে দেখবে। সেদিন গোষ্ঠী হবে। পত্রিকা পরিবার বড় হবে। বৈষ্ণবের মাধুকরী ব্যর্থ হবে না। বৈষ্ণবের ঝুলি কোনো কোনো মানবিক মনের উদারতায় ভরে না উঠলেও অন্তত দু-একটি মুদ্রায় সংলগ্ন থাকবে।

৫.

যাঁরা সম্পাদককে বিশল্যকরণীর সন্ধান দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাঁদের মধ্যে একজন সাধু; বাকি সবাই গৃহী। প্রথমজন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, সম্পাদকের অভিভাবক ও অধ্যক্ষ এবং বাকিরা সম্পাদকের বাংলা বিভাগের আত্মজনেরা। আর সবসময়ের বন্ধু রাধেশ্যাম সাহা এবং কবি বিপ্লব মাজীসহ সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, অমর মিত্র, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদার, জয়া মিত্র, হামিদ কায়সার সম্পাদকের যাপিত জীবনের ভাবনায় সবসময় জায়মান থাকেন। তাঁদের অফুরান শ্রদ্ধা। কৃতজ্ঞতা অবশ্যই অধ্যাপক তপন মণ্ডল ও সবসময়ের কর্মী তাপস পালকে।

সূ ◆ চি

শাশ্বত সমালোচনা

Dr. Dusan Zbavitel
Bengali Folk-Ballads From Mymensingh ২১

শ্রী কালিদাস রায়
মৈমনসিংহ গীতিকা ২৬

দীনেশচন্দ্র সেন
মৈমনসিংহ গীতিকা ৩৬

তারাপদ ভট্টাচার্য
মৈমনসিংহ গীতিকা ৫৯

তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত
পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ৬৮

মুহম্মদ আবদুল হাই
মৈমনসিংহ গীতিকা ৭৮

ফিরে দেখা

বরুণকুমার চক্রবর্তী
নারী : বাংলা গীতিকায় ৮২

সত্যবতী গিরি
পরকীয়া প্রেমের বিচিত্র রূপ : গীতিকায় ৯০

জাত-পাত-সম্প্রদায় : প্রশ্ন-পরিপ্রশ্ন

সুমন ভট্টাচার্য
গীতিকা : জাতিবর্ণমিতি ১০০

অন্তরা মিত্র
বারমাসির চালচিত্রে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ১৩৭

রাধেশ্যাম সাহা
'মৈমনসিংহ গীতিকা' : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১৪৬

গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়
'মৈমনসিংহ গীতিকা' : প্রীতি ও সম্প্রীতির এক অন্য আখ্যান ১৫২

চিরঞ্জিত ঘোষ
হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ঐক্য ও ভাঙনচর্চার ইতিকথা : 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র অন্তরালে ১৫৯

রাজেশ ভট্টাচার্য
'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : একটি পর্যালোচনা ১৬৮

প্রেমপর্ব : প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা

সুতপা দত্ত
'ভিনদেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন' ১৭২

আদিত্য কুমার লালা
'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় নারীপ্রেমের মাহাত্ম্য ১৮১

সুজাতা দে
'মৈমনসিংহ গীতিকা'— প্রেমপর্ব ও জলের ব্যবহার ১৮৯

পাঠকের পাঠ : গীতিকার অন্তরে, অন্দরে

মাধুরী সরকার
'মৈমনসিংহ গীতিকা'র দুটি পালা 'মহুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' ১৯২

দীপঙ্কর মল্লিক
'মহুয়া' : নষ্ট নীড়ের আখ্যান ১৯৬

দেবারতি মল্লিক
'চন্দ্রাবতী' : আচার বনাম হৃদয় ২১০

সুদীপ্ত চৌধুরী
'গোপীচন্দ্রের গান' অলৌকিকতার সন্ধানে ২১৭

অর্ণব সাধুখাঁ
'মলুয়া' গীতিকায় সমাজ ২২৮

প্লাবন সিংহ
'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র নির্বাচিত অংশের একটি পাঠ ২৩৭
মনসা ঘাঁটা
গীতিকার ইতিহাস : বিষয় 'মলুয়া' ২৪৪
তাপস পাল
'মলুয়া' : পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বনাম নারীহৃদয় ২৫৩
স্নিগ্ধা মণ্ডল
সামাজিক প্রেমের পালা 'কমলা' ২৬১
ত্রিসপ্ত প্রদীপ
অথ 'চন্দ্রাবতী' কথা ২৭৪
মহ. আসফাক আলম
'মহুয়া' পালা—একটি পর্যালোচনা ২৮২
ভরত দাস
মনসুর বয়াতীর 'দেওয়ান মদিনা পালা' : আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে ২৮৯
সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়
প্রসঙ্গ : 'মহুয়া' পালা ২৯৭
নন্দিতা মণ্ডল
'মৈমনসিংহ গীতিকা' : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন ৩০১

বিচিত্র বিষয়ের বিন্যাসে

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়
জৈব-বৈচিত্র্যের সন্ধানে গীতিকা ৩০৯
দীপঙ্কর দে
'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা' ও দীনেশচন্দ্র সেন ৩১৯
দীপায়ন পাল
গীতিকা ও নাটক—পারস্পরিক সম্পর্ক ৩২৬
সন্দীপ দেব
'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় উপন্যাসের লক্ষণ ৩২৯
রবিন ঘোষ
অখ্যাত পালার খ্যাতনামা সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন ৩৩৪
সৌগত চট্টোপাধ্যায়
গীতিকায় ফুল ৩৪০

সংরূপের সন্ধানে

শর্মিষ্ঠা দে বসু
ব্যালাড এবং গীতিকা : গীতিকা এবং ব্যালাড ৩৪৭
বাঁশরী মুখোপাধ্যায়
'ময়মনসিংহ গীতিকা'র সমাজ, রোমান্টিকতা ও ট্র্যাজেডি লক্ষণ ৩৫৯

সীমা মুখোপাধ্যায়
'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও রোমান্টিকতা ৩৬৬

খলের স্বরূপ এবং প্রেম ও প্রতিবাদ

বাণী দাস
'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় খল চরিত্র : অপরিহার্য অমোঘ উপস্থিতি ৩৭১
রীতা ভট্টাচার্য
'মৈমনসিংহ গীতিকা' : নারী— প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ৩৭৯
তনুশ্রী বিশ্বাস
'মৈমনসিংহ-গীতিকা' : নারীর প্রেম ও প্রতিবাদের আখ্যান ৩৯৩

লোকায়ত পাঠ

গৌরাঙ্গ বিশ্বাস
'মহুয়া' : লোকায়ত পাঠ ৪০৪
অভিষেক রায় চৌধুরী
লোকসংস্কৃতির আলোকে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ৪১২

মাতৃত্বের স্বরূপ

তনিমা সাহা
গোপীচন্দ্রের গানে 'মা' ৪২৩

চিঠিপত্র ও ভাষা

সুভাষ মিস্ত্রী
'মৈমনসিংহ গীতিকা' : পত্রের ব্যবহারিক তাৎপর্য ৪২৯
নাজিমুল হক
'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় ব্যবহৃত পত্রাবলী ৪৫৭
মিলন সিংহ
গীতিকার ভাষা : 'মহুয়া' পালা ৪৬৮

অবচেতনের দরজায়

রামকৃষ্ণ মণ্ডল
মনঃসমীক্ষণের আলোয় 'মহুয়া' ৪৭২

অবসরের পাঠ : বাউলের একতারা

রজত কর্মকার
রবীন্দ্র-সংগীত ব্রাহ্ম ও বাউল দর্শনের মেলবন্ধন ৪৭৭
ফাহাদ আলম
মৈমনসিংহ গীতিকায় বন্দনা : গতানুগতিকতা বনাম স্বাতন্ত্র্য ৪৮৬

* এ পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখার মতামত, মন্তব্য, ভাবনা, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণত লেখকের— 'তবু একলব্য'-এর সম্পাদকের নয়।

Bengali Folk-Ballads From Mymensingh

Dr. Dusan Zbavitel

I.

Mahuyā

The ballad of Mahuyā, the beautiful foster-daughter of the Gypsies, and young Zamindar Naderchānd, is, as regards its plot, one of the most attractive examples of the folk-epics of Mymensingh...

Mahuyā, the daughter of a Brahmin from Kānchanpur, was stolen and kidnapped, as a six-month-old baby, by Homrā, the chief of a Gypsy band. Mahuyā grows up into a beautiful girl and her 'father' Homrā has taught her the arts which are the means of livelihood of the whole band-singing, dancing and rope-walking. Present at one of their performances is Naderchānd, the son of the Zamindar from Bāmankāndā. Young Naderchānd at once falls in love with Mahuyā and she reciprocates his feelings...

He finds her, at last, in the mountain camp of the Gypsies. Mahuyā, sick with vain desire, recovers at once, but a new obstacle arises between them– Homrā, who does not want to give up his 'daughter'. He sends Mahuyā to kill Naderchānd sleeping outside on the bank of the river. Mahuyā pretends to obey his order, but she does not kill her lover. Instead, both of them decide to run away and they manage to escape, for the moment, the wrath of the revengeful Gypsy...

The only real *hero* of the ballad, in the proper sense of the word, is Mahuyā, the girl. She is *beautiful,* first of all—that is what she has in common with the heroines of other ballads, as well as of the classical stories of ancient Indian (and not only Indian) literature. She is *brave,* not losing hope, though she is depressed after the departure of the Gypsies from Bāmānkāndā, or after the presumed death of Naderchānd in the river; even unavoidable death she faces with courage and with no lamentation. She is also *clever* and *resourceful,* is able to find a way out of every difficulty and a solution to every situation...

Her pure character and the strength of her love, which neither traditional morality, religious prejudice nor social convention can weaken, makes her so deeply human that she can and must become an ideal.

Naderchānd prefers love to his caste, he leaves his home and wealth

consciously and voluntarily. With this, however, he exhausts all his claim to 'heroship'. The author concentrated too many 'ideal features in Mahuyā and raised her too high above her surroundings, to be able to save enough of the listeners' sympathies for another character in his story. It is apparent also from the external description of individual figures which we have already mentioned; and it comes out particularly clearly in the role the poet gave to the rest of the cast : Naderchānd is a devoted lover of Mahuyā, Pālanka is a true friend of the same Mahuyā. All these and other figures are centred around Mahuyā and depicted in their relation to her. Even the negative characters in the ballad (the merchant, the hermit) are nothing but a foil for Mahuyā's nobility.

The whole ballad is composed in a simple, melodic *payār,* with assonances and one and two-syllabic rhymes. When reading the verses, we cannot avoid feeling a certain crudeness, as compared with the verses of classical Bengali epics. The form is definitely not the main point of this, nor, indeed, of any of the ballads.

II.

Maluyā

The ballad of the beautiful Maluyā is one of the longest folk-compositions from Mymensingh.The name of its author is not known. D. C. Sen thinks that it is because of the anti-Muslim character of the ballad, the author of which could lay himself open to persecution by the Muslim rulers.

The young farmer Chānd Binod, living with his mother, is obliged to sell all his small property, after a bad year, and look for other sources of income. Being a skilful hunter of falcons, he decides to earn some money by hunting. His journey comes to its end in the village of Ārāliyā, where he falls asleep, one afternoon, at the *ghāt*. Here he is discovered by Maluyā, the daughter of the rich farmer Hīrādhar and sister of five brothers, who falls in love with Chānd, who is equally enchanted by her beauty. Both of them meet again, next day, and Chānd Binod comes as a guest to Hīrādhar's house. Though superior to Hīrādhar by caste, Chānd knows that he has no chance to win the daughter of the rich man. He is right, the match-maker sent by Chānd's mother is turned away, as many others before him, because Hīādhar hopes for a better bridegroom for his only daughter. Chānd leaves his home to earn money by hunting, and when he returns a rich man, Hīrādhar himself sends his proposal. This first part of the ballad concludes with a long description of Chānd's marriage to Maluyā and their return to the house of Chānd. The happiness of the young couple does not last long.

Compared with Mahuyā, the story of Maluyā has not the same thrill of excitement, but it has many positive points of another kind. First of all, it is more realistic and typical in its selection of theme and episodes, being an

eloquent accusation of the cruelty of the caste system, on the one hand, and the atrocities of the Muslim ruling class, on the other. In the former aspect, it is a direct continuation, in a way, of the Ramayana story, as far as Sita's trial after her rescue from Lanka is concerned. But where Sita was supported and helped by the gods to prove her unstained virtue/which cannot happen in the real life/, Maluyā has to die, unable to get rid of suspicions in any other way/which, I am afraid, could actually have happened/. Thus we are fully justified here in speaking of a *tendency,* stressed by the fact that it is given in the form of a vivid and touching love-story...

This, of course, does not result from any anti Muslim feelings on the part of the folk-poet; as rightly stressed by D. C. Sen, religious bias cannot be attributed to the folk-ballads from Eastern Bengal. It is only an expression of the opposition of poor Bengali people towards oppressors and tyrants.

It would be superfluous to quote once more the way in which the evil consequences of the Hindu caste system are treated, to support our opinion. It is sufficient to note at the beginning of the ballad the rather unusual importance given to the description of the poverty of Chānd Binod and other village people, to understand that the standpoint of our poet is that of a *social critic,* of a man concerned with the sufferings of the people to whom he himself belongs.

III.

Chandrābatī

This is a relatively short ballad, composed, according to the concluding colophon, by Nayān Chānd Ghosh. It centres around the story of the unhappy love of Chandrābatī, the daughter of Bansī Dās, a poet and Siva's devoted follower; both of them are historical personalities, but information about them, especially about Chandrābatī, which have come down to us, are hopelessly mixed up with obvious legends and other folk fantasies.

Since her childhood, Chandrābatī has known Jayānanda from the neighbouring village who comes to help her to pick flowers for her father's sacrifice. They fall in love with each other. Jayānanda sends her a letter asking her to be his wife and his parents try to arrange the marriage through a match-maker. Bansī Dās is a poor man, in spite of his high caste and poetic fame, and gladly accepts the offer. Preparations are being made for the marriage. With no introduction, the second part of the ballad confronts us with a radically changed situation : Jayānanda has fallen in love with a Muslim girl, married her and given up his religion, caste and Chandrābatī . She is deeply hurt and decides to devote the rest of her life to the god Siva. Her father advises her to compose a Bengali Rāmāyan. After some time, Jayā nanda sends a letter asking for forgiveness and a meeting, even if it should be only a meeting to say farewell. Chandrābatī refuses to see him and when

Jayānanda comes, she is in the temple in yogic meditation. In vain he entreats her to come out and see him for the last time. Her meditation over, she leaves the temple; there is a letter saying good-bye on the door and the dead body of the young man in the river. The ballad concludes with the following colophon : "Smiles and tears are like a dream, sings Nayān Chānd/it is difficult to communicate to others the sufferings of one's own heart."

Both parts of the ballad have an energetic exposition, without any introduction, informing the listener of the individual persons or the situation; the poet confronts the listener with a fully developed conflict (in the first part, the love of the young couple, and the betrayal of Jayānanda in the second) and the necessary explanation comes later. Such a poetic procedure is uncommon in folk-poetry.

Also the author's knowledge of human psychology seems to be deeper than that of other folk-poets from Mymensingh; he certainly was no primitive type of poet!...

IV.

Dewān Bhābnā

This ballad is relatively short, due not only to the simplicity of the story, but also to the author's art of condensation.

The heroine of the ballad is Sunāi whose father died, leaving his wife and daughter in poverty. She is beautiful, even at the age of ten, and to secure a good bridegroom for her, the mother goes to live with her at the house of her, brother Bhātuk, a village Brahmin. One day the girl meets Mādhab, the son of a rich Zamindar, at the *ghāt*. They fall in love with each other, exchange love-letters carried by sunāi's friend Sallā and everything points to an early, happy marriage. But Sunāi is also seen by the wicked Bāghrā, a spy of the Muslim Dewān Bhābnā, who is thus informed about the beautiful girl. Prompted by the Dewan, Bāghrā promises the poor Brahmin Bhātuk a rich reward and plans with him the abduction of Sunāi. She gets wind of it, however, and sends a message to Mādhab asking him to take her away from the uncle's house as quickly as possible. Then, when going to fetch water, she is abducted by the Dewan's men; but their boat is seen by Mādhab, who defeats the abductors and takes Sunāi with him to marry her. The Dewan takes his revenge; he imprisons Mādhab's father and lets him go only after Mādhab gives himself up. The father-in-law tells Sunāi that she could rescue her husband by offering herself to the Dewan. She obeys, goes to the palace, makes the Dewan give Mādhab his freedom, but then commits suicide by taking poison.

The main characteristic of this ballad is its intimate lyricism, its lyrical

elements predominating, in a *qualitative* way, over the epic. It is apparent in the very construction of the composition.

V.

Kaṅka O Līlā

The long ballad of Kaṅka and Līlā mentions four authors, in the colophons, and resembles, in a way, the ballad of Chandrābatī.

Kaṅka is the son of a poor Brahmin. As a baby, he lost both his parents and was adopted by a Chandāl couple. But they, too, die very soon and Kaṅka is adopted again by the Brahmin Garga, who gives him a good education. Garga's daughter Līlā is very fond of Kaṅka and, later on, they fall in love with each other. Kaṅka is well versed in Hindu scriptures, but a Muslim saint adoring the Hindu-Muslim deity Satya-Pīr causes a change of heart and the boy composes a song in praise of Satya-Pīr. His composition becomes famous all over the country, but the local Brahmin community hates Kaṅka and succeeds in inciting Garga against him. The old Brahmin believes the slander that Kaṅka has seduced Līlā, and poisons his food. Līlā who has seen it asks Kaṅka to leave their house; the poisoned food is eaten by a cow which dies, making Garga guilty of a great sin. In a dream, Kaṅka sees the saint Chaitanya and goes to join him. Too late Garga comes to his senses and his disciples in vain try to find Kaṅka and to bring him back; people say he was drowned. Līlā is nuable to bear her sufferings. When, at last, Kaṅka comes back, Līlā is dead and Garga leaves his home.

মৈমনসিংহ গীতিকা

শ্রী কালিদাস রায়

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। রস যদি সাহিত্যের প্রাণবন্ত হয়, তবে এই অমার্জিত ভাষায় নিরক্ষর বা প্রায়-নিরক্ষর কবিগণের রচিত গাথাগুলি গীতিসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার পরেই স্থান পাইবার যোগ্য।

এই গীতিকাগুলিকে একহিসেবে জাতীয় সাহিত্য বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির সকল স্তরের লোকের জীবন ইহাতে প্রতিভাত এবং পরস্পর অনুস্যূত হইয়া সেকালের জাতীয় জীবনের একটা সর্বাঙ্গীণ রূপ ইহাতে পরিস্ফুট করিয়াছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, মুসলমান কাজী, দেওয়ান, চণ্ডাল, বেদিয়া, ডাকাত, সওদাগর, চাষি, মইষাল, গোপ, মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি সকল শ্রেণির লোকের জীবনের চিত্র-সমবায় এইগুলিকে জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা দান করিয়াছে।

এইগুলি একাধারে উপন্যাস, নাটক, গান ও কবিতা—বহুবিধ রচনাভঙ্গির সাহিত্যশাখার মিলন হইয়াছে এই গীতিগুলিতে। বাঙ্গালাদেশের সভ্যতর অংশ যখন মঙ্গালকাব্য ও বৈষ্ণবগীতি কবিতায় মুখরিত, বঙ্গীয় কবিগণ যখন চিরপ্রচলিত মামুলি ধারায় পূর্বকবিদের অনুসরণে গান রচনা করিয়া কবিখ্যাতি লাভ করিতেছিলেন—তখন বাংলাদেশের অসভ্য বন্য সীমান্তে নিরক্ষর অথবা অল্প শিক্ষিত কবিগণ এই গাথাগুলি রচনা করিয়া পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের আনন্দ দান করিতেছিল। এই গাথাগুলির ভাষা, ভঙ্গি, রসের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচলিত বঙ্গসাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা বঙ্গের শিষ্টসম্প্রদায়ের প্রচলিত সাহিত্যের ধারার অঙ্গীভূত নয়— শাখা-উপশাখাও নয়।

মৈমনসিংহ জেলার পূর্বাংশে এইগুলির জন্ম, ওই অংশের মধ্যেই ইহা নিবদ্ধ ছিল—লোকের মুখে মুখেই চলিত। ওই জেলার সভ্যাংশের অধিবাসীগণ ও নিকটবর্তী জেলার সভ্যলোকেরা হয়তো এইগুলির সংবাদ রাখিতেন। দরিদ্র অশিক্ষিত চাষিদের রচনার কোনো মূল্য থাকিতে পারে, একথা পূর্বে কেহই ভাবেন নাই। প্রচলিত সভ্যশিষ্টশ্রেণির সাহিত্যের সহিত ইহার ভাব-ভাষায় কোনো মিল না থাকায় এইগুলি পূর্বে কখনও সমাদৃত হয় নাই। অনাদরে উপেক্ষায় ক্রমে এইগুলির বিলোপপ্রাপ্তি হইতেছিল। জাতীয় সাহিত্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি এইদিকে নিপতিত হওয়ায় এইগুলির আবিষ্কার ও প্রচার সম্ভবপর হইল। এইগুলির আবিষ্কারক পল্লী কবি 'চন্দ্রকুমার দে'।

কেহ কেহ এইগুলিকে চন্দ্রকুমারেরই রচনা বলিয়া মনে করেন। চন্দ্রকুমারকে ঘনিষ্ঠ ভাবেই আমি জানিতাম—ছন্দোবন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল, তাঁহার সুরজ্ঞানও ছিল—কিন্তু তিনি এত বড়ো কবি ছিলেন না—যে ঐ অপূর্ব গীতিগুলি রচনা করিতে পারিতেন। গীতিগুলি প্রথম শ্রেণির কবির রচনা। প্রাচীনকালের মূর্খ পল্লীবাসীদের ভাষায় যিনি এমন গীতি রচনা করিতে পারেন, তিনি নিজের সুপরিচিত বর্তমান ভাষায় লিখিলে গোবিন্দদাসের চেয়ে ঢের বড়ো কবি হইতে পারিতেন। চন্দ্রকুমারকে মহাকবিত্বের গৌরব ও অসামান্য আত্মোৎসর্গের গৌরব দুই-এর একটিও দিতে আমরা রাজি নই। যাহা খন্ডিত, ছন্ন, ছিন্ন, ব্যুৎক্রান্ত ও অঙ্গহীন তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন চন্দ্রকুমার—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সভ্যজনসম্মত শিষ্টসাহিত্যের ধারার সহিত মিল নাই বলিয়া পদ্মার এইপারে ওই গীতিগুলির নামও আমরা শুনিতে পাই নাই। কিন্তু সে মিল নাই এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই ওইগুলি এত চমৎকার।

আমাদের শিষ্ট সম্প্রদায়ের সাহিত্যকে প্রধানত তিন ধারায় বিভক্ত করা যায়। একটি ধারা—মঙ্গলকাব্যের ধারা, একটি পদাবলী সাহিত্যের ধারা, আর একটি সংস্কৃত-পুরাণাদির অনুবাদের ধারা। এইগুলি কোনো ধারাতেই পড়ে না। প্রথমত—মঙ্গালকাব্যের ধারায় আমরা দেখি—তিনটি কি চারটি মাত্র কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সেইগুলি রচিত। এই গীতিকাগুলির সহিত সেই কাহিনী কয়টির কোনো সম্পর্ক নাই। এদেশের কবিরা নতুন কাহিনী উদ্ভাবন করিতেই পারিতেন না। অথবা তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল—অন্য কোনো কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিলে দেশে আদৃত হইবে না। কাহিনী উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন হয় না। বিধাতা নিত্যই আমাদের চারিপাশে নব নব কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের চারিপাশের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী লইয়া কিংবা আমাদের নিজেদের জীবনের কাহিনীগুলি লইয়া কাব্যরচনার প্রথাই ছিল না। এ বিষয়ে একটা প্রচলিত সামাজিক শাসনই যেন বিষয়বস্তুর উদ্ভাবনে অথবা প্রাকৃত জীবন থেকে আখ্যানবস্তু নির্বাচনে বাধা ছিল।

পূর্ব মৈমনসিঙের সীমান্তপ্রদেশ ব্রাহ্মণ্যশাসন হইতে দূরে অবস্থিত ছিল—কোনোপ্রকার সামাজিক অনুশাসন এখানে কবিদের স্বাধীনতা হরণ করে নাই। এদেশের অশিক্ষিত কবিগণ তাহাদের চারিপাশে নরনারীর জীবনে যে সকল বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই লইয়া গাথা রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথার অনুবর্তন করেননাই---যাহা তাঁহাদের অমার্জিত হৃদয়কে মুগ্ধ, বিচলিত ও বিস্মিত করিয়াছে—তাহাকেই তাঁহারা সাধ্যমতো রূপদান করিয়াছেন।

পদাবলী সাহিত্য রাধাশ্যামের প্রেমলীলা লইয়া ছোট ছোট গানের আকারে রচিত। এই শ্রেণির গীতিসাহিত্যের সহিতও গীতিকারদের পরিচয় ঘটে নাই। তাই ইহাদের রচনায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয় নয়—সাধারণ নরনারীর প্রণয়ই বিষয়বস্তু এবং গাথাগুলি ছন্দোবদ্ধ গল্পের আকার ধারণ করিয়াছে। গল্পের আকারে সাধারণ প্রাকৃত নরনারীর প্রেমানুরাগের কবিতা এদেশে একটা অভিনব বস্তু।

অসভ্য কৃষকসম্প্রদায় সংস্কৃতের ধার ধারিত না। কেবল পুরাণের যে সব কথা

লোকমুখে সভ্য প্রদেশের সীমা ছাড়াইয়াও আসিয়াছিল—কোনো কোনো গাথায় তাহাদেরই সামান্য উল্লেখমাত্র আছে, কবিকঙ্কণের ফুল্লরার মুখে পুরাণের দোহাই-এর মতো।

সভ্যবঙ্গের সকলশ্রেণির সাহিত্যই ছিল ধর্মসাহিত্য—ধর্মই মুখ্য, সাহিত্যই গৌণ। এই গীতিকাগুলিতে কোনো শাস্ত্রীয় ধর্মের বালাই নাই, সেজন্য সাহিত্যই হইয়াছে মুখ্য। আর যে-ধর্ম ইহাতে গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা মানবধর্ম।

বঙ্গের যে অংশে এই গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছে সে অংশ প্রকৃতির অপূর্ব লীলাভূমি—নদীনদ, খালবিল, অরণ্য, পাহাড় ও পল্লীশ্রীর অপূর্ব সম্মিলন হইয়াছে এখানে। ভিন্ন ভিন্ন বন্য, পার্বত্য ও গ্রাম্য জাতির সমন্বয় হইয়াছে এখানে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে সীমারেখা এখানে খুব দুর্লঙ্ঘ্য নয়, বর্ণাশ্রমী হিন্দুদের সামাজিক শাসন এখানে বিশেষ প্রভাব লাভ করে নাই, রাষ্ট্রীয় শাসনও ছিল এই অঞ্চলে শিথিল, ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এখানে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না—জীবনের সকল পথেই ছিল মুক্তি। এই সকল কারণে মুক্তির আবহাওয়ায় এখানকার লোকের প্রকৃতি ছিল কতকটা অবাধ, শৃঙ্খলাহীন। তাহাদের জীবনের গতি ছিল উদ্দাম, তাহাদের চিন্তা ছিল স্বাধীন, অনুভূতি ছিল গাঢ়হ, মনোবেগ ছিল অবল্গিত। জীবনীশক্তির অবাধ প্রাচুর্যে তাহাদের মধ্যে একটা অব্যাহত সৃজনীশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। এই সৃজনীশক্তি কোনো কলাশ্রীসংগত বা অলংকারশাস্ত্রসম্মত আদর্শ, বিধি-বিধান বা রীতি-পদ্ধতি লাভ করে নাই। এই দেশেরই আত্মপ্রকাশের নিজস্ব একটা বাঁধা ছক বা আদরা ছিল, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের প্রাণের বার্তা অমার্জিত ভাষায় পঙ্গু-দুর্বল ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রাণের অতি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। এগুলি অযত্নসম্ভূত বনফুলের মতো—উদ্যানপুষ্পের শ্রীসৌরভ সৌষ্ঠবগৌরব ইহাদের নাই। লক্ষ লক্ষ বনফুলের মতো এই শ্রেণির রচনা ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যাইত, সভ্যলোক ইহাদের সন্ধান পাইত না। এ অঞ্চলেও এখন বর্তমান সভ্যতার হাওয়া লাগিয়াছে—আর ঐ শ্রেণির গীতিকা রচিত হইবে না—কিন্তু যাহা রচিত হইয়াছে বর্তমান সভ্যতা তাহাকে ধ্বংস পাইতে দিবে না।

এই গীতিকাগুলোর মধ্যে, কোন তত্ত্ব-তথ্য নাই—কোনো বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিচয় নাই, বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয় এমন কোনো উপাদান উপকরণ এইগুলোতে নাই। গীতিকারগণ যেমনটি দেখিয়াছে—তেমনটিই বর্ণনা করিয়া গিয়াছে অন্তরের দরদ দিয়া। মানবজাতি সভ্যতার ক্রমোন্মেষের ফলে যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে তাহার কোনো পরিচয় এইগুলিতে নাই। যে মনোবৃত্তিগুলির মানুষ অধিকারী হইয়াছে বন্য বর্বর অবস্থা হইতেই, যে হৃদয়াবেগ মানবধর্মেরই অন্তর্গত—যে বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলি লইয়া মানুষ পশু হইতে আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে—এই রচনাগুলিতে সেইগুলিই রসরূপ লাভ করিয়াছে। ইহার দ্বারা যে সাহিত্য হইতে পারে সেকালের সভ্যলোকেরা তাহা জানিত না। যাহারা রচনা করিয়াছে তাহারা সাহিত্য বলিয়া অপূর্ব কিছু সৃষ্টি করিতেছে তাহাও কোনোদিন ভাবে নাই। তাহারা ইহাতে আনন্দ পাইয়াছে এবং সকলকে আনন্দ

দিতে পারিয়াছে—ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছে। ঘুণ আপন প্রয়োজনে কাঠ ফুটা করিয়া যায়—কিন্তু তাহাতে অনেক সময় অক্ষরের সৃষ্টি হয়। বর্ণজ্ঞ লোকে দেখে ঘুণ অক্ষর রচনা করিয়াছে চমৎকার। আমরা সেই ঘুণাক্ষরন্যায়ে আজ ঐগুলিকে সাহিত্য বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। যতই অমার্জিত হউক, যতই নিরাভরণ হউক, মানুষের গভীর হৃদয়াবেগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য; আজ আমরা তাহা বুঝিতে শিখিয়াছি।

এই রচনাগুলির মধ্যে কোনো পারিপাট্য বা কলাশ্রীসম্মত আভরণ নাই বলিয়া এগুলি অতিপিনদ্ধবল্কলা শকুন্তলা নয়—এগুলি যেন জেলের মেয়ে মৎস্যগন্ধা। এই মৎস্যগন্ধা 'সত্যবতী' বলিয়া শকুন্তলার মতই রাজরাণী হইবার যোগ্য।

সত্যবতীর সহিত এইগুলিকে উপমিত করা একেবারেই অসঙ্গত নয়। মানবজীবনের চিরন্তন 'সত্য' এইগুলির রসশ্রী সম্পাদন করিয়াছে। দেবতাকে মানুষ বানাইয়া এবং মানুষকে দেবতা বানাইয়া সভ্য বাংলা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সত্যকে পূর্ণরূপে আশ্রয় করে নাই। এই গীতিগুলি মানুষকে মানুষ রাখিয়াই তাহার শক্তিসামর্থ্য, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার সুখ-দুঃখ, তাহার উত্থান-পতনের কথাকেই রসরূপ দান করিয়াছে। এইগুলির প্রধান অবলম্বন মানবজীবনের গভীরতম সত্য। ধর্মতত্ত্ব ও দেবদেবীকে বাদ দিয়াও যে সাহিত্য হইতে পারে—গীতিকারগণ তাহা দেখাইয়াছে।

পল্লীজীবনকে বাদ দিলে বাংলাদেশের কি থাকে? বৃন্দাবনকে বঙ্গপল্লীর সহিত একাত্মক করিয়াই চণ্ডীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছেন। চণ্ডীদাস ছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণব কবির বৃন্দাবন অবাস্তব—অপ্রাকৃত। মঙ্গালকাব্যে ও পদাবলী সাহিত্যে এই পল্লীজীবন উঁকিঝুঁকি দিয়াছে মাত্র—তাহার যথাযোগ্য স্থান লাভ করে নাই। বাঙ্গালার পল্লীজীবন তাহার পরিপূর্ণ সত্যরূপে ফুটিয়াছে এই গাথাগুলিতে।

স্বতই এই গাথাগুলি দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, উৎপীড়নের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছে। সাহিত্য যদি জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি হয়—তবে বাঙ্গালার সাহিত্যে তাহা ছাড়া আর কি থাকিবে? চিরদিনই এই বঙ্গাদেশ দুর্গত, লাঞ্ছিত, দরিদ্র—বন্যা-ঝঞ্ঝা, দুর্ভিক্ষ ও শত শত দৈবদুর্বিপাকে বিধ্বস্ত—জীবনের গতি এখানে পদে পদে ব্যাহত। গভীর হৃদয়াবেগের পরিণাম এদেশে শোচনীয়—আদর্শের অনুসরণ এদেশে সাফল্যমণ্ডিত হয় না। ইহাই বাঙ্গালির জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাহার পক্ষে সিংহলযাত্রী সপ্ত মধুকর ডিঙ্গার স্বপ্ন অলীক, পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের বর্ণনা কেবল লোভার্তিপ্রকাশ—'ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ' কাব্যালঙ্কার মাত্র, বাহির মহালে সাতমরাই টাকা, সোনার চৌদল, রূপার খাট ইত্যাদি মিথ্যা স্বপ্ন, দেবানুগ্রহের সাহায্যে তাহার জাতীয় সমস্যা-সমাধান অলীক জল্পনা মাত্র। বৃন্দাবনের অনাবিল মাধুর্য ও অব্যাহত স্বাচ্ছন্দ্য জাতীয় জীবনের পক্ষে রঙিন অসত্য। স্বাধীন প্রেমের প্রবাহ এইরূপ জাতীয় জীবনে বিয়োগান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। চেষ্টা করিয়া মিলনান্ত করা যায় না যে তাহা নয়, কিন্তু তাহা সত্য হইয়া ওঠে না। এই গীতিগুলির কাহিনীগুলি তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়োগান্ত। এ বিষয়ে কবিগণ কোনো মিথ্যা অনুশাসনকে মানে নাই। এ অঞ্চলে বিশেষত, বিজাতীয় শাসনে নারী যে বড়ই অসহায় সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। নারীর জীবনে গভীর হৃদয়াবেগ ট্র্যাজেডিরই সৃষ্টি করে, একথা গীতিকারগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নারীকে দেবতার বেদীর সম্মুখে ছাগশিশুর মতো শক্তিহীন করিয়া আঁকেন নাই। নারী তাহার সমস্ত শক্তির নিঃশেষে প্রয়োগ করিয়া শেষপর্যন্ত সংগ্রাম করিয়াছে। মঙ্গালকাব্যে আমরা দুই-একটি বীরহৃদয় পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছি—কিন্তু নারীর মধ্যে বিশেষ কোনো শক্তির পরিচয় পাই নাই। ধর্মমঙ্গালে যে নিম্নজাতীয়া নারীগণের চরিত্রে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই নারীগণ এই গীতিকাগুলির নায়িকাদের সগোত্রা। গীতিকার নারীগুলির মধ্যে আমরা মহাশক্তির আভাস দেখিতে পাইয়াছি। বিরুদ্ধ শক্তির কাছে নারীর পরাজয় যেমন সত্য—তাহার সহিত বীরাঙ্গনার মতো সংগ্রামও তেমনি সত্য। গীতিকারগণ একথা ভুলেন নাই।

বৈষ্ণব কাব্যের রাধা মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তিমাত্র, গোপীরা ভাব বিগ্রহময়ী, রক্তমাংসময়ী নয়। মঙ্গালকাব্যের বেহুলা, খুল্লনা ইত্যাদি কবিকল্পনামাত্র। কিন্তু এই গীতিকাগুলির মহুয়া, মলুয়া, সখিনা, মদিনা, সোনাই ইত্যাদি—খাঁটি রক্তমাংসের নারী। ইহাদের বেদনা আমাদের পারিবারিক জীবনের বেদনার মতো পরম সত্য—বেদনাবিলাসমাত্র নয়। ইহাদের বেদনা মর্মের গভীরতম তলকে স্পর্শ করে।

যে সকল কবি এই গীতিগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা নিরক্ষর হইলেও সাহিত্যরচনার মূলসূত্রগুলি তাঁহাদের স্বাভাবিকভাবেই অধিগত ছিল। ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্যবোধ ও সংযম এমনি ছিল যে কোথাও তাঁহারা কোনো উপাদান উপকরণের আতিশয্যের প্রশ্রয় দেন নাই—তাই বলিয়া দৈন্যও কোথাও নাই। ভাবাবেগই ইঁহাদের রচনার প্রধান উপজীব্য। অথচ কোথাও উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নাই—কোথাও ইঁহারা অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করেন নাই—অত্যুক্তি বা অতিশয়োক্তি কোথাও নাই বলিলেই হয়।

ইঁহারা অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক ছিলেন—কিন্তু সভ্যকবিদের মতো রসসৃষ্টির নামে অশ্লীলতা সৃষ্টি করেন নাই—দৈহিক আকর্ষণের কথা কোথাও নাই তাহা নয়, কিন্তু কোথাও রসাইয়া বিনাইয়া কামলীলার বর্ণনা করেন নাই। ইঁহাদের রচনায় উপমা-উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কার ইঁহারা প্রয়োগ করিতে জানিতেন না—তাহা নয়। তবে অলঙ্কারের আতিশয্য কোথাও নাই, যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ অনুগত। ইঁহারা উপমাদির মালা কোথাও গাঁথেন নাই—মাঝে মাঝে ভাবের ঘোরে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যেগুলি স্বতই আসিয়া পড়িয়াছে ইঁহাদের রচনায় কেবল সেইগুলির অতিসংযত প্রয়োগ দেখা যায়।

সভ্য কবিদের মতো ইঁহারা কোথাও বস্তু বা ব্যক্তির তালিকা দেন নাই। অলস নির্জীব প্রকৃতিবর্ণনাও ইঁহাদের রচনায় নাই। আখ্যানমূলক রচনায় মুহুর্মুহু যে বৈচিত্র্যসম্পাদনের প্রয়োজন, তাহার কোথাও অভাব দেখা যায় না। পাছে চিত্তাকর্ষকতা হারায় সেইজন্য কবিরা যথেষ্ট সতর্ক হইয়াছেন। মুখের কথায় নয়, ঘটনার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ভাব-সবলতার সৃষ্টি করিয়া চিত্রপরম্পরার সাহায্যে তাঁহারা আখ্যানবস্তুর উন্মেষ সাধন করিয়াছেন।

নানাপ্রকার প্রতিকূলতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাধা ও নব নব সমস্যার মধ্যে দিয়া বিচিত্র চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্যে দিয়া রসের প্রবাহ উদ্বেল ও ফেনিল হইয়া কলধ্বনির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। মুহুর্মুহু পটভূমিকার পরিবর্তন হইয়াছে, নব নব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুই পাশে আশা-নৈরাশ্য ভয়-ভাবনা সুখ-দুঃখের আলোছায়া আলিম্পন রচনা করিয়াছে পথে পথে—তাহার মধ্যে দিয়া শ্রোতার কল্পনা সতত কুতুকিনী হইয়া চলিতে থাকে—ক্লিষ্ট হইবার বা আগ্রহ-কৌতূহল হারাইবার অবসর পায় না। গৌণ বা অপ্রধান চরিত্রগুলি কেবল মূল চরিত্রের পোষকতাই করে নাই—তাহাদের নিজস্ব বিশিষ্ট গৌরব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কবিরা সেগুলিকেও পরিপূর্ণাঙ্গ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন।

এই কবিদের কল্পনা ছিল অবাধ, রাজার প্রাসাদ হইতে বেদিয়ার কুটির, পাহাড়-জঙ্গল হইতে গ্রামের মাঠ, রণক্ষেত্র হইতে রান্নাঘর, সমুদ্র হইতে গোষ্পদ সর্বত্রই ছিল তাহার অবাধ গতি। গীতিকার চরিত্রগুলিকে ইঁহারা বল্গাবদ্ধ অশ্বের মতো চালিত করেন নাই। তাহারা আপন স্বাভাবিক গতিতে ঝঞ্ঝাবজ্রময়ী প্রকৃতির মধ্য দিয়া জীবনের ঝঞ্ঝাবজ্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতে করিতে চলিয়াছে যেন একমাত্র নিয়তির নির্দেশে।

এই গীতিকারগণ অশিক্ষিত হইলেও ইঁহাদের পর্যবেক্ষণশক্তি ও মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অল্প ছিল বলিয়া মনে হয় না—ইঁহারা যেভাবে আশা-নৈরাশ্যের দোলাচলচিত্ততা, প্রেমানুরাগের বিবিধ বৈচিত্র্য, নারী-হৃদয়ের স্বভাবসারল্যের অনিবার্য পরিণাম, ব্যাধের মায়াজালে আবদ্ধ চকিতপ্রেক্ষণা বনহরিণীর মতো অবলাদের নানা বিড়ম্বনা ইত্যাদির কথা বর্ণনা করিয়াছেন—তা পাকা নিপুণ আর্টিস্টেরই মতো।

ইঁহাদের রচনার উপজীব্য বড়ই করুণ। এত করুণ, এত মর্মস্পর্শী, এত বেদনাঘন যে ইহাকে রসে উত্তীর্ণ করা বড়ই দুরূহ। কিন্তু কবিরা সর্ববিধ আতিশয্য ও উচ্ছ্বাস বর্জন করিয়া এমন স্বল্পাক্ষরে, তুলিকার সংযত স্পর্শে—চিত্রগুলিকে ফুটাইয়াছেন যে কাব্যের রস চোখের জলে একেবারে লোনা হইয়া যায় নাই।

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের যথাযথ প্রয়োগে উৎকৃষ্ট কাব্যের সৃষ্টি হয় কবিরা স্বভাবতই তাহা বুঝতেন—চিরপ্রচলিত বিভাবের খবর তাঁহারা রাখিতেন না—সহজ বুদ্ধিতে তাঁহারা স্বাভাবিক বিভাব বলিয়া যাহা মনে করিয়াছেন—তাহারই সাহায্যে তাঁহারা রসসৃষ্টি করিয়াছেন। মহুয়া নামক গীতিতে কবি রতিরসের এমন একটি উদ্দীপন বিভাবের অবতারণা করিয়াছেন—যাহাতে বর্তমান যুগের রসতত্ত্ববিদ্‌গণও বিস্মিত হইবেন। মহুয়া বেদিয়ার প্রতিপালিত চুরি করা মেয়ে, স্বাস্থ্যে যৌবনে পরিপুষ্টাঙ্গী, বনে জঙ্গালে সে বাস করে, গ্রামে গ্রামে বেদিয়াদের সঙ্গে বাজি দেখাইয়া বেড়ায়, রৌদ্রে হিমে জলে মুক্ত বায়ুতে অঙ্গের লালিত্য কতকটা বিনষ্ট, লাবণ্য কতকটা ম্লান, গঠনসৌষ্ঠবের মধ্যে পৌরুষের একটা ছাপ পড়িয়াছে। বাঁশের উপর উঠিয়া মহুয়া বেদেদের সহিত বাজি দেখাইল। মহুয়াকে বাঁশে উঠিতে দেখিয়া—'বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা হ'ল খাড়া।' তাহারপর সে—করতালের রুনু ঝুনু শব্দের সহিত 'ঢোলে মাইলো তালি।' এই অবসরে নদ্যার ঠাকুরের বুকে

মন্মথ ফুলশর হানিল। এইরূপ বিভাবের দ্বারা পূর্বরাগসৃষ্টি চণ্ডীদাসের মতো একজন বড়ো কবির উপযুক্ত।

সভ্যবঙ্গের সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান নাই বলিলেই হয়। যেখানে আছে সেখানেই সে নির্জীব নিস্তেজ, যেন পটে আঁকা সাজানো গোছানো চালচিত্রের মতো। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের কোনো গূঢ় সংযোগ নাই। প্রকৃতির শোভা যেন কাব্যালংকারের অন্তর্গত, ক্বচিৎ কোথাও চালচিত্রের কাজ করিয়াছে। এই গীতিকাগুলিতে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। গীতিকার চরিত্রগুলি প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া ঘরের দুলালদুলালী। মানবজীবন ও প্রাকৃতিক জীবন যেন ওতপ্রোতভাবে অনুসূত্য—Psycho-physical Parallelism-এর মতো একই জীবনসত্তার যেন সমান্তরাল অভিব্যক্তি।

গীতিকাগুলিতে প্রকৃতির প্রাধান্য আছে বলিয়াই উহা যে মানুষকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়। শামুকের বহিরঙ্গের মতো উহা তাহার জীবনসত্তার অঙ্গীভূত—তাহার বেশি নয়। মাঠগোঠ, গ্রাম, আম্রকুঞ্জ কেয়াবন ও বেতবনের মধ্য দিয়া যে প্রাকৃতিক জীবনের ধারা চলিয়াছে, গীতিকার চরিত্রগুলি যেন সে ধারা অবলম্বন করিয়া কলহংসের মতো নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে।

প্রকৃতি যে পল্লীকবিদের মুগ্ধ বা বিস্মিত করিয়াছে, তাহা নয়—তাহারা যে প্রকৃতির মাধুর্য উপভোগ করিয়াছে, তাহাও নয়—মানবহৃদয়ের সহিত উহার গভীর সংযোগ বলিয়া মানবহৃদয়ের আকর্ষণে উহা স্বতই আসিয়া পড়িয়াছে। ক্বচিৎ কখনো পৃথকভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও অপূর্বতা মনের কোনো বিশিষ্ট অবস্থায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সঞ্জীববাবু পালামৌর কোলদের কথায় বলেছিলেন—বন্যেরা বনে সুন্দর, —শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। তারা তাদের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যেই সুন্দর, —ওই আবেষ্টনী থেকে বিচ্যুত হলে ওই সব চরিত্রের সৌন্দর্য আর থাকে না।

কাহিনীগুলি আমাদের কানের কাছে আহ্বান জানাইয়াছে গানে, কিন্তু প্রাণের কাছে আবেদন জানাইয়াছে চিত্রে। মনের গায়ে ছায়াচিত্র-পরম্পরার সন্নিপাত করিয়া এক একটি গীতি অগ্রসর হইয়াছে। এই চিত্রগুলিতে বর্ণচ্ছটা নাই, কিন্তু গভীরভাবে মনের ওপর দাগ আঁকিয়া যায়। কত স্বল্পাক্ষরে তাহারা চিত্র ফুটাইত তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই—

বিদেশেতে যায় যাদু যদ্দূর দেখা যায়।
পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায়॥
বাঁশের ঝাড় বন জঙ্গাল পুতের পিঠে পড়ে।
আঁখির পানি মুছ্যা মায় ফির‍্যা আইসে ঘরে॥

গীতিকাররা স্বভাবতই বুঝিয়াছিলেন—পূর্বরাগের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনুরাগই প্রেম। সেই প্রেমই তাঁদের কাব্যে প্রধান উপজীব্য। মনে হয় পল্লীকবিদের সমাজে পূর্বরাগের স্বাধীনতা ছিল। পূর্বরাগজ প্রেমের মর্যাদা সে সমাজ স্বীকার করিত। স্বাধীনভাবে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন যে সাহিত্যের পরম সম্পদ একথা সভ্যদেশের কবিরাও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এমন নির্ভীকভাবে স্বচ্ছন্দে কয়জন কবি তাকে সাহিত্যে রূপদান করিতে পারিয়াছেন? সম্ভবত সমাজের অনুশাসনই বাধা

ছিল। অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করে বৈষ্ণব কবিরা রাধাপ্রেমকে সাহিত্যে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন। গীতিকার কবিরা লৌকিক প্রেমকেই পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করিতে পারিয়াছেন। এ প্রেম জাতিগোত্র মানে নাই, লৌকিক ধর্মও মানে নাই, হিন্দু মুসলমানের যে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্ভেদ্য গণ্ডি তাহাও ইহা অনায়াসে পার হইয়াছে।

গীতিকারগণ প্রেমকে ছোট করিয়া পাতিব্রত্যকে বড়ো করিয়া দেখান নাই। তাঁহারা দেখাইয়াছেন পাতিব্রত্যের মূল ভিত্তি সমাজশাসন নয়, কোনো বিশিষ্ট সংস্কার নয়, বৈবাহিক বন্ধনের মন্ত্রপাঠ নয়, ইহার মূল ভিত্তি প্রেমে। প্রেমই পাতিব্রত্যকে অটল করিতে পারে। প্রেম যে সামান্য পল্লীবালাকেও মহীয়সী মহিলা করিয়া তুলিতে পারে—প্রেমের জন্য নারী যে কী অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহার নারীত্বের মহাশক্তি যে কীরূপ রণরঙ্গিণী হইয়া উঠিতে পারে—এবং পরিশেষে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেলে কীরূপে হাসিতে হাসিতে মরণকে বরণ করিতে পারে, গীতিকারগণ তাহা দেখাইয়াছেন।

গীতিকাগুলিতে এই প্রেম নানা অবস্থা, নানা বিচিত্র সংস্থিতির মধ্য দিয়া—নানা দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে চলিয়াছে, কর্মজীবনে সহযোগিতার মধ্য দিয়াও ইহা আপনাকে সার্থক করিয়াছে। অবাঞ্ছিতকে এড়াইবার জন্য, অত্যাচারীর হস্ত হইতে আপন দয়িতকে বাঁচাইবার জন্য, এই প্রেমকে নিষ্কলঙ্ক চিরভাস্বর রাখিবার জন্য নারী আপনার কমনীয়তা ও সৌকুমার্য বিসর্জন করিয়াছে। সাধ করিয়া নারী প্রেমের সঙ্গো সঙ্গো জানিয়া শুনিয়া অপার দুঃখ বরণ করিয়াছে। সমাজ তাহাকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সমাজের নিষ্ঠুর দণ্ডকে বরণ করিয়াই প্রেম সর্বত্যাগী হইয়াছে। প্রেমের গৌরবেই সকল দুঃখের মধ্যেও প্রেমিকা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে এবং তাহার গৌরব রক্ষার জন্য হাসিতে হাসিতে মরণকে বরণ করিয়াছে। প্রেমের আহ্বানে দয়িতের জন্য মৃত্যুবরণ—ইহা প্রশস্য বটে, কিন্তু ইহার চেয়েও বড়ো ত্যাগ প্রেমিকা দয়িতের সুখের জন্য সপত্নীর করে (হস্তে) দয়িতকে সমর্পণ করিয়া নিজে চিরদাস্য বরণ করিয়া লইয়াছে। এরূপ সর্বসংস্কারমুক্ত সর্বস্বপণ প্রেমধর্মের উচ্চাদর্শ কি করিয়া অশিক্ষিত কবিরা লাভ করিল ভাবলেও বিস্মিত হইতে হয়।

গীতিকার কবিগণ স্বাধীন প্রণয়ের জয়গান করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতেন—প্রেম স্বাভাবিকভাবে সঞ্জাত না হইলে তাহা লইয়া সাহিত্য রচনা হয় না। তাই বলিয়া তাঁহারা সতীধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। বরং ইঁহাদের রচনায় যদি কোনো নির্দিষ্ট কল্যাণময় লক্ষ্য থাকে, তবে সতীধর্মেরই মহিমাকীর্তন। এই সতীধর্ম ইঁহাদের মতে প্রথাগত সংস্কার-মাত্র নয়—যে সতীধর্মের মূল পূর্বরাগের মধুর আবেষ্টনীর মধ্যে হৃদয়ে হৃদয়ে গাঢ় মিলনে—সেই সতীধর্মের স্বর্গীয় মহিমাই ইঁহাদের বহু রচনার উপজীব্য।

কোনো অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের সহায়তায় নয়, কোনো দৈবশক্তি বলে নয়, সিদ্ধপুরুষপ্রদত্ত মন্ত্রাদিবলে নয়, সতী আপনার অন্তর্গূঢ় মানুষী শক্তির দ্বারা সতীধর্মের মর্যাদা রাখিবার জন্য কী অসাধ্য সাধন করিতে পারে—কবিরা তাহাই দেখাইয়াছেন।

সতী প্রতি মুহূর্তে আত্মজীবনকে ওষ্ঠপুটে ধরিয়া আততায়ীর খড়্গের তল দিয়া পাষণ্ড মায়াবীর মায়াজাল ছেদন করিয়া, শতপ্রলোভনের ব্যূহভেদ করিয়া বারবার বিজয়িনী হইয়া চলিয়াছে।

মৃত্যুবরণ না করিয়া অসহায়া দুর্বলা নারী তো নিজের সতীধর্মকে বিজয়ী করিতে পারে না—বিধাতা নারীকে সেই শক্তি দেন নাই। কবিরা একথা বুঝিতেন। তাই তাঁহাদের সাহিত্য অসত্য হইয়া পড়ে নাই। নারী প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছে—কিন্তু তাহার নারীত্বের শক্তিও তো সীমাবদ্ধ। সে শেষপর্যন্ত হয়তো জীবন ও সতীধর্ম দুই-ই একসঙ্গে রাখিতে পারে নাই—জীবনের বিনিময়ে সে প্রেমের মর্যাদা রাখিয়াছে, সতীধর্মকেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। যতক্ষণ জীবন রাখিতে পারিয়াছে ততক্ষণ সে সহস্র লাঞ্ছনার মধ্যে বেদনার পরাকাষ্ঠার মধ্যেও তাহার ধর্ম বজায় রাখিয়াছে। যখন আর উপায় নাই তখন সে জীবনদান করিয়াছে, সংগ্রাম করিতে সে ছাড়ে নাই।—এইখানেই স্বাভাবিকতা—ইহাতেই সাহিত্য সৃষ্টি। কবির কৌশলে যদি সহস্র বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুঝিয়া দুর্বল নারীদেহে প্রেম ও জীবন দুই-ই বিজয়ী হইত—তাহা হইলেই অস্বাভাবিক হইত। আততায়ীয় শিরে হঠাৎ বজ্রাঘাত হইলে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ প্রবৃত্তি তৃপ্তি লাভ করিত বটে—রসতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইত না।

সতীজীবনে দারুণ সমস্যার যিনি সৃষ্টি করেছেন, সমাধানের ব্যবস্থা তিনি করেননি; সংগ্রামের সৃষ্টি করেছেন—যুঝবার জন্য যিনি অপরিমেয় শক্তি দেননি—সেই বিধাতাকে নিষ্ঠুর বলে আমরা নিন্দা করতে পারি—কিন্তু যা সত্য তাকে সহ্য করতেই হবে এবং সাহিত্যও তাই নিয়ে রচিত হবে, উপায় নেই।

আমাদের দেশের সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকে একটা কথার চল আছে—'আপনা মাংসে হরিণী বৈরী।' যে বিধাতা সুস্বাদু মাংস দিয়ে বনের হরিণীকে গড়েছেন—তিনিই নারীর দেহে রূপযৌবন দিয়েছেন। এই রূপযৌবনই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। কখনও কখনও সৌভাগ্যের নিদান, কিন্তু অনেক স্থলে এটাই পরম শত্রু। আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যে এই সত্যটিকে স্বীকার করা হয়েছে—কিন্তু কোথাও একে রসসাহিত্যে রূপায়িত করা হয়নি। গীতিকাররা এই সত্যের গভীর কারুণ্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকে রসরূপ দিয়েছেন। অসহায়া দুর্বলা কোমলাঙ্গী রমণীকে এত সম্পদ যিনি দিয়েছেন—তিনি দস্যুর হাত থেকে এই সম্পদ রক্ষা করবার শক্তি দেননি। এই অবিচারের বেদনা জগতের সাহিত্যকে যুগে যুগে করুণ করে রেখেছে। বর্তমান মানবসভ্যতা বিধাতার অবিচারের কতকটা ক্ষতিপূরণ করেছে বলেই তার প্রধান গৌরব। বর্তমান যুগে সভ্যদেশে বনসম্পদ যেমন সহজে দস্যুরা হরণ করতে পারে না—নারীও তেমনি, রূপযৌবন নিয়ে কোনো সভ্যদেশে সহজে বিপন্ন হয় না। গীতিকাররা যে দেশের যে সমাজের জীবনযাত্রা সাহিত্যে ফুটিয়েছেন—সে দেশ সে যুগ ও সে সমাজ সভ্যতার রক্ষাকবচ লাভ করেনি। তাই তখনকার দিনে যা সত্য ছিল—কবিরা কঠোর ও নিষ্করুণ হলেও তাকে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং গভীর দরদের সঙ্গে তাকেই সাহিত্যে রূপ দিয়েছিলেন।

বুদ্ধি অনেক সময় দুর্বলকে রক্ষা করে—চাতুরী ক্ষীণপ্রাণের পক্ষে কম বল নয়।

এমন অনেক জীব আছে, যারা কেবল চাতুর্যবলে হিংস্রজীবনের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে তা সত্য। তরলচিত্ত সবল পুরুষের চোখের মোহ দুদিনেই কেটে যায়—অবলা নারী দলিত বনমালার মতো পথের পাশে পড়ে থাকে। নারীজীবনের এমনি কারুণ্যময় সত্যগুলোকে নিয়ে কি চমৎকার সাহিত্যই না পল্লীকবিরা গড়েছেন।

এই গভীর কারুণ্যকে তাঁরা রসে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলেন কঠোর সংযমের দ্বারা, উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বা ভাববিহ্বলতার অশ্রুজলে রসকে লবণাক্ত করেননি।—অধিকাংশকে অব্যক্ত রেখে দুচারটি ব্যঞ্জনাময় বাক্যে আংশিক চিত্র দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের কবিকর্তব্য সমাপ্ত করেছেন।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

মৈমনসিংহ গীতিকা

দীনেশচন্দ্র সেন

পৌরাণিক উপাখ্যান-বিষয়ক কাব্যকথা তো প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যাইতেছে। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বংশীদাস ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল'-এর পরে রামকান্তের একখানি 'পদ্মপুরাণ' না পাওয়া গেলেও বঙ্গসাহিত্য বিশেষ শ্রীহীন হইবে না; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পরে কবিকঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' না পাওয়া গেলেই বা বিশেষ ক্ষতি কী? ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের অবশ্যই কিছু মূল্য আছে। কিন্তু 'মহুয়া', 'মলুয়া' বঙ্গের অন্য কোথায় পাইব? 'দেওয়ানা মদিনা', 'ফিরোজ খাঁ' প্রভৃতি পালা যে বঙ্গসাহিত্যের একটা নতুন দিকের উপর আলোকপাত করিতেছে—এই অপূর্ব জিনিস বঙ্গসাহিত্যে সুদুর্লভ। বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুম্‌কি দেওয়া বেনারসী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই সব সরলকথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুকুও ধার করা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব সুন্দর—তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম! নানা দিক দিয়া এই সব পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের অফুরন্ত সুধা, অচিন্তিতপূর্ব মাধুর্য ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃতভাণ্ড নহে, ইহা আমাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের কাছে এত ভালো লাগিয়াছে। চন্দ্রকুমার বঙ্গসাহিত্যের নিজ ভাঁড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন—তাহা হোটেলের মসলা-দেওয়া মুখরোচক বিলাসখাদ্য সম্ভার নহে, ইহা আমাদের পল্লী-অন্নপূর্ণার শ্রীকরকমলের দান—জীবনদায়ী অন্নব্যঞ্জন। এগুলি জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল শুধু সীতা-সাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি—এখন আমরা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে লইয়া তদপেক্ষা বেশি গৌরব করিতে পারিব—যেহেতু তাহারা ঘাগরা-পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ী-পরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে।...

পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব-মৈমনসিংহের কোনো না কোনো যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, যে সকল অবাধ ও অপ্রতিহত অত্যাচার যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে—সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ছন্দের—শব্দৈশ্বর্যের কাঙ্গাল হইতে পারেন, তাঁহারা হয়তো বড়ো বড়ো তালমানের সন্ধান জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় অফুরন্ত

কারুণ্য ও কবিত্বের উৎসস্বরূপ ছিল। যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অশ্রু ফুরাইয়া গিয়াছে কিন্তু এই সকল কাহিনির শ্রোতাদের অশ্রু কখনও ফুরাইবে বলিয়া মনে হয় না।...

২

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুসলমান-বিজয় এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী দুই-তিন শতাব্দীকাল অপর এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি এই পূর্ব-মৈমনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু সেনবংশীয় রাজারা পশ্চিম-মৈমনসিংহ অধিকার করিলেও বহু বিল-সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবহুল পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সুতরাং এই পূর্ব-মৈমনসিংহ চিরকালই সেনবংশ-প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও কৌলীন্য হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও রাজবংশীয় নৃপতিগণ তদ্দেশ-প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্মের আদর্শ বিস্মৃত হন নাই। কামরূপ শেষকালে তান্ত্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়, কিন্তু তখন পূর্ব-মৈমনসিংহ সেই দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্রাধিকারের পূর্বে কামরূপে যে হিন্দুধর্মের আদর্শ ছিল, পূর্ব-মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই হিন্দুধর্ম উদার, তাহাতে বৌদ্ধ কর্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল। এই হিন্দুধর্মে বল্লাল সেন প্রবর্তিত 'গৌরীদান', আচার-বিচারের চুলচেরা হিসেব, ছোঁয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। পূর্ব-মৈমনসিংহ রঘুনন্দনকে গ্রহণ করে নাই। সম্ভবত তখনও জাতিভেদ সেই দেশে এমন কঠোর হইয়া উঠে নাই। তথায় অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। তখন প্রণয়পথে ব্যর্থকাম হইয়া, হিন্দু রমণী আজন্ম কুমারীব্রত অবলম্বনপূর্বক তপস্বিনী হইতে পারিতেন।

সুতরাং শত শত আচার-বিচার, খাদ্যাখাদ্যের তালিকা ও দুরন্ত পাঁজির আইনকানুনে বাঁধা এই প্রাচীন জীর্ণ হিন্দু সমাজের যে মূর্তি কৃত্রিমতাকে জীবন্ত করিয়া খাঁড়া হাতে করে বর্তমান কালে এক বৎসর হইতে পুরো পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চাঁড়াল মায়ের স্তন্যপানপূর্বক চাঁড়ালের ঘরে প্রতিপালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠিল এবং যাহাকে কেহ স্পর্শ করতেও ঘৃণা বোধ করিত, ব্রাহ্মণকুল-তিলক গর্গ নিজের গায়ের পবিত্র নামাবলী দিয়া সেই অস্পৃশ্য বালকের গা মুছাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণসমাজে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এদিনে কি তাহা সম্ভবপর হইত? চাঁড়াল মাতাকে ব্রাহ্মণসন্তান শত কোটি বার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাযমুনার ন্যায় পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করাও এখনকার দিনে সম্ভবপর হইত না। পিতামাতার মত না লইয়া বয়স্কা কন্যা গোপনে নিজে বর মনোনয়নপূর্বক তাহার কণ্ঠে মাল্য দেওয়ার গন্ধর্বরীতি এ সমাজ হইতে অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়েছে। এই পল্লীগাথার রমণীরা অনেকবার কুলধর্ম বিসর্জন দিয়াছেন, কিন্তু কখনই নারীধর্ম ত্যাগ করেন নাই। বরঞ্চ নারীধর্মের যে জীবন্ত মূর্তিগুলি এই সবল গাথায় পাওয়া যাইতেছে—তাহারা পাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিপদে, ধৈর্যে, উপায়-উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় অতুল্য।

৩

সুতরাং হিন্দু সমাজের এই অভিনব চিত্রগুলিতে যে জীবন আনন্দ পাওয়া যাইতেছে, তাহা শ্রাবণের নদীপ্রবাহের ন্যায় শক্তি ও স্ফূর্তিতে ভরপুর। এই অবাধ শক্তি ও আনন্দের বন্যায় ঐরাবতের ন্যায় দুর্জয় বাধাবিঘ্ন ভাসিয়া গিয়াছে। আমরা প্রাচীন সমাজের আবর্জনাময় পঙ্কিল ডোবা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, এই গিরিনদীর স্ফূর্তি দেখিতে দেখিতে হয়তো আমাদের ভিতরকার জীর্ণ সংস্কারগুলি ক্ষণকালের জন্য মন হইতে খসিয়া পড়িতে পারে। এই পল্লীগাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা। ইহা আমাদের অন্ধ চক্ষে দৃষ্টিদান করিতে পারে। এই পালাগুলিতে দেখা যায়, আমরা যে সতীত্বের বড়াই করিয়া থাকি, তাহার জন্ম আইনকানুনে এবং আচার্য্যের মস্তিষ্কে নহে, তাহার জন্ম প্রেমে, তাহা নিজের বলে বলীয়ান। বাহিরের শক্তি যে পাতিব্রত্যকে রক্ষা করে, তাহার শক্তি দুর্বলতার ছদ্মবেশমাত্র, কিন্তু প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়াছে, প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহা ঋষিবচনের প্রতীক্ষা করে না। তাহা হিন্দুসমাজের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্ত মানবজাতির আরাধনার ধন। সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে।

এই যে মনের অগাধ অনুরাগ, পল্লীগাথাগুলি পড়িলে দেখা যায় তাহার কি দুর্জয় শক্তি! হাতির সাহায্যে মর্কট আসিলে, তাহা দেখিলে হাসি পায়। এই অটল নিষ্ঠাকে যে ব্যক্তি একাদশীর উপবাস ও প্রোষিতভর্তৃকার আইন জারি করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, সে সোনার উপর গিল্টি করিয়া এবং হীরের উপর রং ফলাইয়া তাহা উজ্জ্বল করিতে চাহে। মহুয়ার প্রেম কি নির্ভীক আনন্দপূর্ণ। শ্রাবণের শত ধারার ন্যায় দুঃখ আসিতেছে, কিন্তু এই প্রেমের মুক্তাহার গলায় পরিয়া মহুয়া চিরবিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে। তাহার পার্শ্বে পালঙ্কসখীর ত্যাগ কিরূপ স্বল্প কথায় ব্যক্ত ও অনাড়ম্বর! উহা বাক্য দ্বারা পল্লবিত না হইয়াও শ্রেষ্ঠতম আদর্শে পৌঁছিয়াছে। মলুয়ার পূর্বরাগ, বাসরঘরে স্বামীর সহিত আলাপ, কাজীর ধৃষ্ট প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর—এই সমস্ত কি অপূর্ব। এই অতুলনীয় চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে, স্বামীবিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সর্পদষ্ট স্বামীর পার্শ্বে এবং শেষ দৃশ্যে ডুবন্ত মন-পবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্বত্র অনুরাগের অরুণরাগে উজ্জ্বল। অভাব, উৎপীড়ন, চূড়ান্ত দুঃখ, এক দিনের জন্যও তাহাকে ম্লান করে নাই। সর্বশেষে শাপগ্রস্তা লক্ষ্মীর ন্যায়, উহার বিজয়ী প্রেমের কিরীট অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছে। রাগে উজ্জ্বল, বিরাগে উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল এই মহীয়সী প্রেমের মহাসম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়? কৃষক-কবিরা এই প্রতিমা কোথায় পাইল? অবিশ্বাস করো না, তাহাদের কুটিরেই, এই ভগবতী তাহাদেরকে সাক্ষাৎ দিয়া থাকেন—না হইলে মদিনা, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, ক্ষেতে আল বাঁধা হইতে শালি ধানের গুছি স্বামীকে হাত বাড়াইয়া দেওয়া অবধি শত শত ছোটো কাজে—জীবনে মরণে—কি নিজের মূর্তিতে ভগবতীর প্রতিমা

উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়া দেখায়নি? এই খণ্ডে সখিনাকে দেখাইতে পারিলাম না—মলুয়া ও মদিনার পার্শ্বে এই সখিনা মূর্তি যেন পদ্ম ও বেলার পার্শ্বে ফুল্ল গোলাপ। এই বিচিত্র কৃষক-কুটিরের বাগানেও সূর্যের আলো ও মুক্ত বায়ুতে স্বর্গীয় সুবাস ও ভাবলোকের সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে। রাজপ্রাসাদেও তা সর্বদা সুলভ নয়।

লীলার লীলাবসান, সোনাইয়ের নির্বাক ও নির্ভীক মৃত্যু, কেনারামের ভক্তি, পাষাণময়ী কাজলরেখার চরিত্রে চিরসহিষ্ণুতা এবং প্রগাঢ় প্রেমনিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি, চন্দ্রার তপোনিরত শান্তি, এই চিত্রগুলো দেখিয়া, দেখাইয়া গৌরব করিবার সামগ্রী। ইহার প্রত্যেকটি মূর্তি মন্দিরে স্থাপিত হইয়া পুজো পাইবার যোগ্য।

কোথাও কৃত্রিমতা, বাঁধাবাঁধি, মুখস্থ-করা শাস্ত্রের গৎ, ইহার কিছুই নাই। পরিণয় আছে কিন্তু পুরোহিতের মন্ত্রপূত দম্পতির চেলির বাঁধের ন্যায় তাহা বাহ্যাড়ম্বর নহে। এই গীতিসাহিত্যের উদারমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিল শত ধারা ছুটিয়াছে, তাহার প্রস্রবণের ন্যায় অবাধ, নির্ঝরের ন্যায় নির্মল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর মুক্তাবর্ষী বর্ষার অফুরন্ত মহাদানের ন্যায় অজস্র। এই ভালোবাসার পুরস্কার—দুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ, মৃত্যু ও বিষপান। এই পুরস্কার পাইয়া বন্ধুর দুরারোহ দুর্গম পথে অনুরাগের খরপ্রবাহ চলিয়াছে; স্বীয় গতির আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমস্ত বাধা উপেক্ষাপূর্বক, এই আত্মতৃপ্ত, সংসারবিমুখ, ঊর্ধ্বমুখী মন্দাকিনী স্বীয় মানস কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় বঙ্গরমণী সমাজদ্রোহী, পরিজনের প্রতি উপেক্ষাময়ী, দুর্জয় দর্পশীলা। কিন্তু এই সকল গাথায়, তিনি গৃহের গৃহলক্ষ্মী, সমাজের নিকট নতশিরা, তাঁহার দর্প-অভিমান নাই, লজ্জার অবগুণ্ঠন তিনি টানিয়া ফেলিয়া রাজপথে বাহির হয়েন নাই; কিন্তু তথাপি অনুরাগের ক্ষেত্রে তিনি জগজ্জয়ী—কুটিরে থাকিয়াও তিনি স্বর্গের বৈভব দেখাইতেছেন। সমাজের অনুশাসনে ধরা দিয়াও তিনি চিরমুক্ত, আত্মার অটল বল প্রকাশ করিতেছেন—সমাজের ভ্রূকুটিতে তিনি মর্মপীড়া পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ সেই বাধায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচর্য কি, দেওয়ান সাহেবের হাব্‌লিতে তাহা মলুয়া দেখাইয়াছে। মহুয়া ও সখিনা বঙ্গরমণীর রণরঙ্গিণী মূর্তি। এই দেশের মেয়েরা ফুলের কুঁড়ির ন্যায় কীরূপে অনুরাগে ঝরিয়া পড়ে, লীলা ও মদিনার সেই অনুরাগ মূর্ত। দুঃখ আত্মাকে কিরূপ সহিষ্ণুতা ও ভক্তির বর্মে আবৃত করিয়া রাখে চন্দ্রা তা নীরবে দেখাইতেছেন।

৪

শুধু বঙ্গরমণীর কথা নহে, এই সকল গাথায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক দিক স্পষ্ট হইয়াছে। ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, সূর্যের ছড়া, চণ্ডী ও মনসা দেবীর আদি গান, ব্রতকথা, রূপকথা, ডাক ও খনার বচন—প্রাচীন সাহিত্যের এই বিবিধ রচনার সঙ্গে এই গীতিগুলির এক পংক্তিতে স্থান হইবে। পূর্বোক্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইহারা এক ছন্দে এক তানে বাঁধা—তাদের ভাষাগত রচনা ও ভাবগত ঐক্য

সকলের চক্ষেই পড়িবে। সেই চিরপরিচিত অমার্জিত বঙ্গের পল্লীকথা এবং 'কোন্ কাম করিল' প্রভৃতি কথার ভঙ্গি এই সমস্ত সাহিত্য জুড়িয়া আছে।

ব্রাহ্মণ্যের পুনরুত্থানে, গিরিনদীর তেজে সংস্কৃতের প্রবাহ আসিয়া আমাদের ভাব ও ভাষা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্বোক্ত পুথিগুলির গ্রাম্য ভাষা ও ভাবের সঙ্গে পরবর্তী সাহিত্যের বিভিন্নতা অতি স্পষ্ট। মনসাদেবীর ভাসান ও চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের কয়েকখানি পুথির উপর পণ্ডিতদের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা তাহাদের ভাব ও ভাষার উপর তুলি চালাইয়া তাহাদিগকে সংস্কৃতযুগের সাহিত্যের অঙ্গীয় করিয়া লইলেন, কিন্তু জোড়া অনেক সময় বেখাপ্পা হইয়া রহিল। চণ্ডীকাব্যের মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাসীতে গ্রাম্য ভাব ও ভাষার ছন্দটি ঠিক রাখিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল অকৃত্রিম সরল ভাষার উক্তির মধ্যে হঠাৎ 'জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ' এহরূপ দু'-একটি সংস্কৃতাত্মক পদ নির্ঝরগতির মধ্যে শৈলখণ্ডের মতো পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুরারি শীলের সহিত কালকেতুর কথাবার্তা, ফুল্লরার সহিত লহনার ঝগড়া, বণিকসভায় মালাচন্দনের উপলক্ষ্যে বাগবিতণ্ডা প্রভৃতি অংশ খাঁটি প্রাচীন ছড়া। কিন্তু ভগবতীর রূপবর্ণনা, খুল্লনার ছাগলরক্ষার সময়ে বনে বসন্তের আবির্ভাব, সুশীলার বারমাসী প্রভৃতি রচনায় বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত একটা মুখোশ পরাইয়া দিয়াছেন। বঙ্গপল্লীর দয়েলটি ময়ূর সাজিয়া বাহির হইয়াছেন। এই সকল মন্তব্য মনসামঙ্গালের প্রতিও ধর্মমঙ্গালের প্রতিও তুল্যরূপেই প্রযোজ্য।

এই ছড়াগুলো ছিল সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগের। তখন সিন্ধাবাদের স্কন্ধে বৃদ্ধের মতো বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃতের আদর্শ আসিয়া এরূপ দুরন্তভাবে চাপিয়া বসে নাই। এই সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকা বেনে, সদ্‌গোপ, বৈশ্য, ব্যাধ এমনকি ডোম জাতীয়। ইহাতে ব্রাহ্মণের টোলে বেনে ধর্মশাস্ত্র পড়িতেছে, গন্ধবেনে সত্য বলার অপরাধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে গলাধাক্কা মারিয়া সদর দরজার বাহির করিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মণ্যগৌরবের অদ্বিতীয় ব্যঞ্জনাস্বরূপ যজন-যাজন ও যজ্ঞের সময়ই যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন হইত। পৈতাটা তখনও ব্রাহ্মণের অপরিহার্য অঙ্গীয় হইয়া দাঁড়ায় নাই। কোথাও যাওয়ার সময়ে উত্তরীয় ও উপবীত উভয়ই পোশাকী দ্রব্যের ন্যায় খুঁজিয়া বাহির করিয়া গলায় পরিতে হইত।

যে সকল গান ও ছড়া, দেবমণ্ডপে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে গীত হইয়া পূজার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছড়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়িয়া লইলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি একালের কোনো স্থপতি সংস্কার করেন তবে নতুন-পুরাতনে যে বিষম সংযোগ হয়, তাহা চক্ষে ঠেকিবেই। এই রিফুকর্মটা কখনই বেমালুম হয় না। মুকুন্দরাম, বিজয়গুপ্ত, ঘনরাম ও রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ প্রাচীন পালাগুলি লইয়া যে নব্যলীলা খেলিয়াছেন, তাহাতে দুই-যুগের ভাব ও ভাষার আদর্শ পৃথক হইয়া আছে, তাহা অতি সহজেই

ধরা পড়িয়া যায়।

আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহা দ্বারা সংস্কৃতপূর্ব যুগই তাহাকে মণ্ডিত করিয়াছিল। সেই যুগেই গোরক্ষনাথের অমরালেখ্য অঙ্কিত হয়, সেই যুগেই বেহুলা ও মালঞ্চমালার ন্যায় রমণীতিলকেরা বঙ্গসাহিত্যের কিরীট উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই সময়েই কালু ডোম, কালকেতু ও চাঁদ সদাগরের ন্যায় মৌলিক, একব্রত, অটল চরিত্রগুলি এই সাহিত্যের বিভূষণ হয়। পরবর্তী কবিগণ পূর্বের সেই কাব্যগুলিকে শোধন করিয়াছেন, ভাষা উজ্জ্বল করিয়াছেন, ভাব ও ছন্দ কবিত্বে ভূষিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই পূর্বযুগের মহিমান্বিত চরিত্রগুলিকে স্বল্পাধিক পরিমাণে গৌরবহীন ও খর্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের হাতে চাঁদ সদাগরের ন্যায় বীর গৌরব হারাইয়া কতকটা হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন।

যে কালে সেই সকল প্রাচীন পালা রচিত হইয়াছিল (১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে) তখন হিন্দুজাতি সতেজ ও সবল ছিল। তখন সমাজে গুণের আদর ছিল, গুণীর অভাব ছিল না। বাঙ্গালি জাতির আশয় ও আকাঙ্ক্ষা উচ্চ ছিল, বাঙ্গালি বণিক সমুদ্রকে রত্নাকর নামে অভিহিত করিয়া, সেই অসীম জলপথকে রত্নসংগ্রহের রাজপথ বলিয়া মনে করিত। স্বাধীন দেশের তেজোদৃপ্ত লোকেরা এই সকল পালা রচনা করিয়াছিলেন। এইজন্য কালু ডোমকে সত্যরক্ষার জন্য কাম্বার খড়্গের নিকট নিজ মস্তক বাড়াইয়া দিতে দেখিতে পাই, চাঁদ সদাগরেরও এইরূপ ধনুর্ভঙ্গ পণ—এইরূপ সর্বত্যাগী বীরত্ব দেখিতে পাই। কালকেতুর অসামান্য নৈতিক বল ও গোরক্ষনাথের অমলধবল চরিত্রশোভার শুভ্রজ্যোতিদর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। রমণীচরিত্রগুলি প্রায় সকলেই তপস্বিনী; এইরকম দুর্দান্ত ভুবনবিজয়ী প্রেমের তুলনা কোথায় মিলে?...

৫

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পূর্ব-মৈমনসিংহে সেনরাজ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রভাব পৌঁছায় নাই। এইজন্য সপ্তদশ এমনকী অষ্টাদশ শতাব্দীর ছড়াগুলিতেও আমরা ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অথবা সংস্কৃতের আনুগত্য বিশেষরূপে দেখিতে পাই না। পূর্ব-মৈমনসিংহের সাহিত্য বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের সাহিত্যের মতো নহে। এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙ্গালির ঘরগুলিকে এতটা আঁটাআঁটি করিয়া বাঁধে নাই। এখানে পাষাণচাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি নাই। এখানে ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় নাই এবং রমণীদের জন্য পিঁজরা তৈরি হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুরের কবি জয়নারায়ণ সেন তাঁহার বিদেশগমনোদ্যত নায়কের মুখে পত্নী সুনেত্রাকে সাবধান করিয়া বলেতেছেন, 'আমি চলে গেলে পরপুরুষের রব যেন তোমার কানে বজ্রের মতো কঠিন ঠেকে এবং পরপুরুষের ছায়া যেন তোমার চক্ষে কালসর্পের মতো আতঙ্কদায়ক হয়।'

প্রোষিতভর্তৃকাদের কেশ কীরূপ আলুলায়িতভাবে থাকা উচিত, তাহাদের বস্ত্রাঞ্চল ধূলায় লুটাইয়া কিরূপে সংসারে ঔদাসীন্য দেখাইবে, এই সকল বিষয়ে চন্দ্রভান তাঁহার পত্নী সুমিত্রাকে উপদেশ দিয়া যাইতেছেন। এমনকী কৃত্তিবাসের সীতা রামের মুখে সন্দেহের কথা শুনিয়া মৃদু কান্নার গুঞ্জরণের সহিত বলিয়াছিলেন, নিতান্ত শিশুকালেও তিনি ছেলেদের সাথে খেলা করেন নাই। এই ছোঁয়াচে রোগ সমস্ত জাতিকে পাইয়া বসিয়াছিল।

পাঠক মৈমনসিংহ-গীতিকায় এক নতুন রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। প্রেম জিনিসটা কষ্টকে বরণ করিয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু নিজের আনন্দই উহার পরম তৃপ্তি, ইহা শক্তিপ্রয়োগে পাওয়া যায় না। এই দুর্লভ জিনিসটা হিন্দুর ঘরে কি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, গীতিকাগুলো পড়িয়া পাঠক নিজে তাহার পরিচয় পাইবেন। এই মৈমনসিংহ হইতেই আমরা মালঞ্চমালা, শঙ্খমালা এবং পুষ্পমালার কথা পাইয়াছি। এই কথা চতুষ্টয় গীতিকথা নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সংকলিত অপূর্ব 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' পুস্তকে এই গীতিকথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেই গীতিকথার পার্শ্বে এই খণ্ডে প্রকাশিত 'কাজলরেখা' এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য, এটিও একটি গীতিকথা। গীতিকথাগুলি শুধুই উপাখ্যান। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কাজলরেখা ছাড়া অন্য সমস্ত গীতিকাই ঐতিহাসিক ঘটনামূলক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনা উভয়েরই আদর্শটা ঠিক একরূপ। উপাখ্যানগুলোতে অনেক আজগুবি কথা আছে, ঐতিহাসিক গাথায় একটিও আজগুবি কথা নাই, প্রভেদ এই পর্যন্ত। কিন্তু উপাখ্যানের কাজলরেখা ও মালঞ্চমালা এক দিকে এবং ঐতিহাসিক মলুয়া ও মদিনা অপর দিকে। প্রেমের রাজ্যে ইহারা সহোদরা। শ্মশানের চিতায় যে সুন্দরী নারী হ্যালিডে সাহেবের সম্মুখে একটা দীপশিখাতে নিজের আঙ্গুলটি ভস্মীভূত করিয়া স্থির অটলমূর্তিতে বলিয়াছিল, 'সাহেব, বল ত দেহটা আরও পোড়াইয়া দেখাই। তুমি না বলিতেছ, আমি আগুনের যন্ত্রণা বুঝি না, এইজন্য না বুঝে সহমরণ যাইতেছি।' সেই সুন্দরী রমণী ও মলুয়ার কি কোনো প্রভেদ আছে? এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড়ো হয় নাই—চিরকাল প্রেমে বড়ো হইয়াছে। জননীরূপে তিনি জগতের বরেণ্যা, স্ত্রীরূপে তিনি জগতের প্রাণ। প্রকৃতি যেইখানে সেই প্রাণ দান করেন, সেইখানে সে প্রাণ অপূর্ব হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের পুরোহিতের কি সাধ্য যে সেই অপূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি করিতে পারে? এইজন্য এই গীতিকাগুলির সর্বত্র দেখা যায় পুরুষ ও নারী নিজেরা বিবাহের পূর্বে পরস্পরকে আত্মদান করিয়াছেন, তারপর বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভেলুয়া সুন্দরী' গাথা প্রকাশিত হলে পাঠক তাহাতে দেখিতে পাইবেন পিতামাতার মতের বিরুদ্ধে দম্পতি নিজেরাই মাল্য বিনিময় করিয়াছেন। ফিরোজ খাঁর পালায় সখিনা নিজে দেওয়ানকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া পিতা ওমর খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন।

এই খণ্ডেই সোনাই নিজে মাতা ও মাতুলের মত না লইয়াই মাধবকে বররূপে বরণ করিয়াছেন। বিবাহের অনেক পূর্বে কমলা প্রদীপকুমারকে নিজের হৃদয় দিয়া ফেলিতেছেন এবং মলুয়াও সেইভাবে চাঁদ বিনোদকে দেখে মুগ্ধা হইয়া পড়িতেছেন— এমনকী চন্দ্রার মতো ধর্মশীলা সংযমশীলা তপস্বিনী নারীও বিবাহ-প্রস্তাবনার বহু পূর্বে জয়চন্দ্রকে স্বামীরূপে হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছেন। এই ভাবের ছড়ায় এক সময়ে বঙ্গদেশ প্লাবিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পৌরোহিত্যের প্রভাবে নায়িকাদের সেই স্বাধীন মনোনয়ন-প্রথা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এমনকী নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শানুসারে এই প্রথার সৌন্দর্য আবিষ্কার করা ত দূরের কথা, ইহা কুৎসা ও লজ্জাজনক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। খুল্লনা ও ধনপতির বিবাহ-পূর্ব প্রেমচিত্রটি মুকুন্দরাম যেন দাঁতে জিভ কাটিয়া কোনোরূপে সামলাইয়া লইয়াছেন। প্রাচীন ছড়াটা তিনি পরিবর্তন করিয়াও তাহাতে যথেষ্ট আভাস রাখিয়া গিয়াছেন। যাহাতে বুঝা যায় যে পিতামাতা ঠিক করিয়া দেওয়ার পূর্বেই বরকন্যার নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করার রীতি পূর্বে প্রচলিত ছিল। স্বয়ং চৈতন্যপ্রভু বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন এবং শুভদৃষ্টির পূর্বে দম্পতির মধ্যে চারি চোখের একটা প্রেমদৃষ্টির বিনিময় হইয়াছিল,— তাহার আভাস চৈতন্যভাগবতে আছে। এই পূর্বরাগটাকে সমাজের পাণ্ডাগণ শেষে একেবারে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া অষ্টম বৎসর বয়সে গৌরীদানের প্রথা পুথি হাতে করিয়া জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু অভূতপূর্বভাবে মৈমনসিংহ হইতে আমরা সমাজের পূর্বাধ্যায়ের কতকগুলি আলেখ্য পাইতেছি। নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেই প্রদেশে জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে নাই, এইজন্য আদিম আদর্শের গৌরশ্রী সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই সকল গীতিকায় নায়ক-নায়িকাদের কাহারও বাল্যকালে পরিণয় হয় নাই। চৌদ্দ, পনেরো এমনকী সতেরো বৎসর পর্যন্ত মেয়েদিগকে অবিবাহিতা দেখিতে পাই। মুকুন্দরাম পুরাতন চণ্ডীর পালার রিফুকর্ম করিতে গিয়া বেশ একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রাচীন ছড়ায় ছিল যে, খুল্লনা যৌবনে পদার্পণ কবিয়া ধনপতি সওদাগরের প্রেমে আকৃষ্ট হন। কি ভয়ানক কথা! নতুন সমাজের পাণ্ডা ব্রাহ্মণ-কবি একজন পুরোহিতকে উপস্থিত কবিয়া খুল্লনার পিতাকে খুব ধমকাইয়া দিয়াছেন। সাত বৎসরের মেয়ের বিবাহের মহাফল এবং তাহারপর আট বৎসর, ঊর্ধ্বে নয় বৎসর,—ইহার পরেও বিবাহ না হইলে যে পিতামাতার অদৃষ্টে ঘোর নরক, শাস্ত্রের বচনসহ পুরোহিতের মুখে কবিকঙ্কণ লক্ষ্মীপতিকে তাহা বেশ ভালো করিয়া বুঝাইতেছেন। এদিকে বেহুলাও যৌবনে পদার্পণ করিয়াই লক্ষ্মীন্দরকে বিবাহ করিতেছেন, এমনকী নিজে উপযাচক হইয়া এই বিবাহে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, —বিবাহবাসরে লক্ষ্মীন্দর তাঁহার আলিঙ্গানলিপ্সু হইতেছেন—এই সকল কথা সংস্কৃত-যুগের কবিগণ প্রাচীন ছড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিরার সময়ে যথাসাধ্য আড়ালে ফেলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মৈমনসিংহ-গীতিকায় যে সকল কথা খুব স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে, বঙ্গদেশের অন্যত্রও সামাজিক আদর্শ কতকটা সেইরূপ ছিল এবং তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। সেনরাজগণের পূর্বে হিন্দুসমাজের যে আদর্শ ছিল, তাহা আমরা এমন পরিষ্কারভাবে এই গাথাগুলিতে পাইতেছি যে, তাহাতে দ্বিধা করিবার কোন অবকাশ নাই।

একমাত্র মহুয়া এই গাথাসাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী—ইহা ঘরেরও নয়, বাহিরেরও নহে। এই গীতিকায় জাতিবিচার, কুলশীল, পদমর্যাদা সমস্তই প্রেমরত্নাকরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। অতি সংক্ষেপে—নাট্যগরিমায়, পর পর কৌতূহলপ্রদ প্রাণোন্মাদী দৃশ্য পরিবর্তনে, নায়ক-নায়িকা অপূর্বভাবে কবিত্ব ও ত্যাগমহিমা-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা মুক্ত গগনের, সীমাবিহীন পথের পথিক—মহার্ণবে ডুবন্ত নৌকার নিমজ্জমান আরোহী যেরূপ ধ্রুবনক্ষত্রের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি, সেইরূপ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বর্গীয় পণে অটল। ইন্দুমতীর ন্যায় প্রেম-পারিজাত-স্পর্শে ইঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াও অমর হইয়াছেন। ইঁহারা কোনো গৃহের সম্পর্কিত নহেন, ইঁহারা পরস্পরের প্রতি উদ্দাম অনুরাগ ভিন্ন অন্য কোনো বিধি মানেন নাই,—প্রেম ভিন্ন ইঁহাদের ধর্ম নাই—পরস্পরের সাহচর্য ভিন্ন ইঁহারা কোনো গৃহসুখ কল্পনা করেন নাই। ময়নামতীর গানে বর্ণিত আছে, রাজা গোপীচন্দ্রের অনেক স্ত্রী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাসের পরে তাঁহারা সকলেই নূতন রাজা খেতুর গৃহে গমন করিয়া নবদাম্পত্যের অভিনয় করিলেন। ইহাতে অবশ্য কোনো দোষের কারণ নাই। সেকালে রাজপ্রাসাদের ইহাই স্থানীয় প্রথা ছিল। একমাত্র অদুনা ঘৃণার সহিত সেই রীতি পদদলনপূর্বক গোপীচন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া রহিলেন। এই অদুনা আমাদের গীতিকাগুলির নায়িকাদের সঙ্গে এক পর্যায়ে বসিবার যোগ্য।

৬

এই নিরক্ষর কবিগণ সরল বাঙ্গালা কথায় উদ্দীপনার ছন্দে তাঁহাদের গীতি গাহিয়া গিয়াছেন। এই সকল গানে কতকগুলি উর্দু শব্দ আছে, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কোনো কারণ নাই। গত পাঁচ-ছয়শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাটা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই হইয়া গিয়াছে। মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র ও সামাজিক আদর্শ অনেকটা আরবি ও পারসি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ, সেই সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহাদের নিত্যকর্মের জন্য অপরিহার্য। আমাদের যেরূপ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ, আরবি ও পারসির সহিত তাঁদেরও কতকটা তাই। তাহা ছাড়া মুসলমান এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সুতরাং নানা কারণে বাঙ্গালা প্রাকৃতের সঙ্গে কতকটা উর্দুর সংস্রব ঘটিয়াছে। মুসলমান আমাদের প্রতিবেশী, আমাদিগের কিছুতেই তাহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভারতের অব্যবহিত পশ্চিমদেশের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে কতক পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে এবং তাহা আমাদের নিত্যকথিত

ভাষার অঙ্গীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মিশ্রভাষা আমাদের চাষার কুটীরে, এমনকী হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্যন্ত ঢুকিয়াছে। বাঙ্গালার অভিধান হইতে এখন আর তাহা বাদ দেওয়া চলে না।

কিন্তু হিন্দু লেখকগণ মুখে যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃতের ঘোর প্রভাবের বশবর্তী হইয়া লিখিবার সময় সেগুলি অন্যরূপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও শ্রুত 'খাজনা' তাঁহাদের লেখনিতে 'রাজস্ব' রূপে পরিণত হয়— চিরপরিচিত 'ইজ্জৎ' 'সম্মান' হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে 'জবরদস্তি' 'বলপ্রয়োগে', 'দুস্তি' 'বান্ধবতায়', 'জমি' 'মৃত্তিকায়', 'আশমান' 'আকাশে' এবং আরও শত শত নিত্যকথিত বিদেশি শব্দ, যাহাদের অস্থিমজ্জা বাঙ্গালার জলবায়ুতে দেশীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারা লিখত সাহিত্যে সংস্কৃত আগন্তুকের নিকট নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এক সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতগণ অতিকায় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানি করিয়া এই ভাষার পর্ণ কুটিরটিকে ঐরাবতশালায় পরিণত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইভাবে আরবি-পারসির পণ্ডিতগণ উক্ত দুই ভাষার অপর্যাপ্ত ও অবৈধ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এখনও মুসলমানী বাঙ্গালা নামক একটা উদ্ভট সামগ্রীর সৃষ্টি করিতেছেন। বস্তুত মুসলমানী বাঙ্গালা ও পণ্ডিতি বাঙ্গালা, ইহাদের কোনোটাই বাঙ্গালার স্বরূপ নহে, উহারা আমাদের ভাষার বিদ্রূপ ও একান্ত পরিহার্য। ভাষা জিনিসটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নহে। দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা পুস্ট হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় জীবন্ত গতির পথে, ইচ্ছাক্রমে বর্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, স্বীয় ললাটলিপিতে কোনো শিক্ষকের ছাপ মারিয়া পরিচিত হইতে চায় না।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় আমরা বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপটি পাইতেছি। বহু শতাব্দীকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সমস্ত বঙ্গাবাসীর ভাষা। এইক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই। এই মৈমনসিংহ-গীতিকায় উর্দু-উপাদান ততটা ঢুকিয়াছে, যতটা প্রকৃতপক্ষে এই দেশে আসিয়া বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। এই গীতিসাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের, এখানে পণ্ডিতগণের রক্তচক্ষে শাসাইবার কিছু নাই। লেখকদের মধ্যে হিন্দুও যতটি মুসলমানও ততটি। এই সাহিত্যে আবার হিন্দু নায়ক, মুসলমান নায়িকা এবং মুসলমান নায়ক, হিন্দু নায়িকা পাইতেছি। প্রকৃত ঘটনা কবিরা যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুর ঘরে স্বাধীন প্রেমচর্চার সুযোগের অভাব অনুভব করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানী আয়েষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা মুসলমান-বিদ্বেষের ফল নহে। ইংরাজি উপাখ্যানের পূর্বরাগ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানি করিতেই হইবে, সুতরাং এক দিকে সমস্ত সমাজবন্ধন-বিচ্যুতা কপালকুণ্ডলারূপ অভূতপূর্ব চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, অন্য দিকে মুসলমান সমাজ হইতে আয়েষাকে সংগ্রহ করিয়া লেখকের প্রাণের কামনা মিটাইতে হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু নিজের সুবিধার জন্য

সাহিত্যে এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা কিন্তু জাতিগত বিদ্বেষের চিহ্ন বলিয়া এই ব্যাপারটা ধরিয়া লইয়াছেন। এটি মোটেই তাহাদের ভালো লাগে নাই। আজকাল অনেক মুসলমান লেখক বঙ্কিমবাবুর এই কাজের প্রতিশোধ লইতে গিয়া হিন্দু রমণীকে মুসলমান নায়কের অনুরাগিণী করিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু মৈমনসিংহের গীতিকায়, সেইরূপ আড়াআড়ির ভাব বা জাতীয় বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না। মুসলমান কবি কালিদাস গজদানী এবং মমিনা খাতুনের প্রেম অকুণ্ঠিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, পার্শ্বেই আবার ঈশা খাঁর প্রতি অনুরক্তা কেদার রায়ের ভগিনীর চিত্রটি আছে। আর একটি গাথায় ব্রাহ্মণ জয়চন্দ্র এক মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়াছেন ও অপর একটিতে সুরৎজমাল ও ব্রাহ্মণ রাজকন্যা অধুয়ার প্রেম প্রসঙ্গ আছে। এই সকল পালাগানের শ্রোতা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উপর যে দেবতা হাসিয়া খেলিয়া ফুলশর সন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি হিন্দুর পরিকল্পিত হইলেও আদবেই জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই গাথাগুলিতে জাতীয় বিদ্বেষের কণিকা মাত্র নাই, সত্য ঘটনা স্বকীয় গৌরবের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া শ্রোতার অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে।

হিন্দু ও মুসলমান যে বহুশতাব্দীকাল পরস্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন, এই গীতিগুলিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। দেওয়ান সাহেবদের অত্যাচারের কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা 'মুসলমানী অত্যাচার' বলিয়া অভিহিত করা অন্যায় হইবে। এই অত্যাচার দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ব্যভিচারীর ব্যভিচার—ইহার জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় নাম দেওয়া যায় না, ইহা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম বা জাতিঘটিত কোনো ঘটনা নহে। একদিকে দেওয়ান জাহাঙ্গীর যেরূপ মলুয়ার উপর অত্যাচার করিতেছেন, তেমনি বিচার না করিয়াই মুসলমান কাজীকে শূলে চড়াইয়া দিতেছেন। একদিকে দেওয়ান ভাবনা সোনাইকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছেন, অপর দিকে সোনাইয়ের মাতুল ব্রাহ্মণ্যকুলগৌরব ভাটুক ঠাকুর তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। একদিকে যেরূপ অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান জাহাঙ্গীর, দেওয়ান ভাবনা,—অপর দিকে তেমনি বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারী পরস্ত্রীলিপ্সু হিন্দুকুলতিলক হীরণসাধু ও মগাধিপতি রাংচাপুরের আবু রাজার নির্মম মূর্তি আমরা দেখিতে পাই। বস্তুত সে যুগে প্রবলের অত্যাচার সর্বত্রই ছিল। যদি রাজা ভালো হইতেন, তবে প্রজার সুখের সীমা থাকিত না। সোনার ভাটা লইয়া রাইয়তের ছেলেরা খেলিতে থাকিত, কলার পাতা বেচিয়া লোকে পাকা বাড়ি তুলিত, ঘাস-বেচা লোকে হাতি কিনিতে সাধ করিত, লোকে ধনকড়ি যেখানে সেখানে শুকাইতে দিত, ধনরত্ন পথে ফেলিয়া রাখিলেও চোরদস্যুর উপদ্রব থাকিত না। আবার রাজা কি মন্ত্রী অত্যাচারী হইলে রাইয়তেরা তাহাদের বলীবর্দ্দ, লাঙ্গাল-জোয়াল এবং ফাল বিক্রি করিয়াও ত্রাণ পাইত না, অতিরিক্ত খাজনার দায়ে দুধের ছেলেকে বিক্রয় করিত। বানিয়াচঙ্গের অত্যাচারী দেওয়ান দুলালের কারাগার হইতে সিংহলরাজ্যের কারাগার অল্প ক্রুর বলিয়া

বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং এই দুর্বলের উৎপীড়ন ইতিহাসবিশ্রুত সনাতন ঘটনা, হিন্দু বা মুসলমানের নামাঙ্কিত করিয়া ইহা জাতিবিদ্বেষ উসকাইয়া দেওয়ার উপলক্ষ করা উচিত নহে। মুসলমান রাজত্বে, মুসলমানের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশি ছিল, এইজন্য হয়তো অত্যাচারীর সংখ্যা তাহাদের মধ্যে বেশি ছিল,—কিন্তু সে দোষ ক্ষমতার, কোনো শ্রেণিবিশেষের নহে। বিজয় গুপ্তের পদ্ম-পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, একদিকে অত্যাচারী মুসলমান ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে পৈতা কাড়িয়া লইয়া তাহার মুখে থুথু দিতেছে, অপরদিকে হিন্দু গোপেরা মুসলমান কাজীর দাড়ি উপড়াইয়া তাহার মুখে ছাগের রক্ত মাখিয়া দিতেছে। সুতরাং কেহই কম নহে।

বাঙ্গালা ভাষাটা প্রাকৃতের রূপভেদ। কিন্তু টোলের পণ্ডিতেরা এই ভাষায় অপর্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ আনয়ন করিয়া ইহার শ্রী বদলাইয়া দিয়াছেন; এইজন্য কারও কারও মনে হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত যুগের পূর্ব সাহিত্য, বিশেষ এই গীতিকাগুলি পাঠ করিলে সেই ভুল ঘুচিয়া যাইবে। খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্তী তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই সকল গাথায় 'হস্তী' (হাতী) শব্দ 'আত্তি', 'বর্ষা' শব্দ 'বাস্যা', 'শ্রাবণ' শব্দ 'শাওন', 'মিষ্টি' শব্দ 'মিডা', 'শিকার' শব্দ 'শিগার' প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবেই সর্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনও চাষারা এই ভাষায় পাড়াগাঁয়ের কথা বলিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া আমাদের মাথা ঘোলাইয়া গিয়াছে; আমরা অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃতশব্দ সংশোধনপূর্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতেছি। এই সংশোধন-কার্য ভারতচন্দ্র এমন কৌশলের সঙ্গে চালাইয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত কয়েকটি বাঙ্গালা স্তোত্র নাগরী অঞ্চলে লিখিলে তাহা নিছক সংস্কৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

৭

বাঙ্গালার মাটির যে কি আকর্ষণ তাহা স্বভাবের খাঁটি সৃষ্টি এই গীতগুলির সর্বত্র দৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালার চাঁপা, বাঙ্গালার নাগেশ্বর ও কুমুদ ফুল, বাঙ্গালার কুটিরে কি সুন্দর দেখায়, এই সাহিত্যের পথে-ঘাটে তাহার নিদর্শন আছে। বর্ষার কদম্ব বৃক্ষ, মান্দার গাছের ডালে-ঘেরা কদলী বন, নদীর ধারে কেয়া ফুলের ঝড়, মুক্তাবর্ষী প্রস্রবণপ্রতিম বৃহৎ তরুশাখা হইতে অজস্র বকুল ফুলের দান—কাব্যবর্ণিত কর্মশালার মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া আমাদের শ্রম অপনোদন ও চোখের তৃপ্তি ঘটাইয়া যায়। কোথাও বর্ণনার বাহুল্য নাই, অথচ কৃষকের দৃষ্টি যেরূপ কিছুতেই মাথার উপরকার আকাশ ও চোখের সামনের শ্যামল বনরাজি এড়াইতে পারে না, এই কাব্যসাহিত্যের নানা ঘটনার মধ্যে পারিপার্শ্বিক শোভাদৃশ্যগুলিও সেইরকম পাঠকের অপরিহার্য সহচররূপ সঙ্গে থাকিবে। বিশেষত অনেক স্থলেই পূর্ববঙ্গের দৃশ্যাবলী মানসপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। পূর্ববঙ্গের প্রচলিত ভাষায় পূর্ববঙ্গের দৃশ্য কীরূপ স্পষ্ট হইয়া

উঠে তাহার দু' একটি দৃষ্টান্ত দিব। চাঁদ বিনোদ ক্ষেত্রে ধান কাটিতে যাইতেছে, প্রথম ধানকাটার পরে বাতা নামক লতার 'ডুগুল' (অগ্রভাগ) দিয়া কৃষকেরা লক্ষ্মীর আসন তৈরি করে,—তাহাতে কয়েক গাছি ধানের ছড়া লক্ষ্মীদেবীকে সর্বপ্রথম উৎসর্গ করা হয়। চাঁদ বিনোদ প্রথম দিন ধান কাটিতে যাইতেছে, দুটি ছত্রে কবি তাহার মূর্তি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। "পঞ্চ গাছি বাতার ডুগুল হাতেতে লইয়া।/মাঠের পানে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া।" প্রথম ধান ঘরে আনার স্ফুর্তি বারমাসী গানে ব্যক্ত হইতেছে। "গুরু গুরু ডাকে মেঘ জিল্‌কি ঠাডা পড়ে" ছত্রটিতে 'জিল্‌কি' ও 'ঠাডা' শব্দের দ্বারা বর্ষার তমসাচ্ছন্ন আকাশ হঠাৎ বিদ্যুৎস্ফুরণে কীরূপ ক্ষণতরে আলোকিত হইয়া যায়, পূর্ববঙ্গবাসীর চক্ষে সেই চিরপরিচিত দৃশ্যের আভাস আনয়ন করিতেছে। ছেলে না খাইয়া বিদেশে যাইতেছে, অতি দুঃখে মাতা তাহার পথের প্রতি সজল দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া আছেন। বাঁশের ঝাড় ও জঙ্গালের ডাল চাঁদ বিনোদের পৃষ্ঠদেশ ছুঁইতেছে, —এইভাবে পুত্র গভীর জঙ্গালের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল, মাতা চোখের জল মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিলেন,—এইরকম বহু দৃশ্যে বাঙ্গালার স্নিগ্ধ কুটিরটি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হইতেছে। "হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নেমে আসে"—কি সুন্দর পদ! তাহা হইতে অপূর্ব 'বৌ কথা কও' পাখির বর্ণনা। মাথায় বজ্র, অনবরত শ্রাবণের জলে সিক্ত দেহ,—সেদিকে দৃক্‌পাত নাই—পাখিটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে 'বৌ কথা কও' বলিয়া অভিমানিনী প্রিয়তমার মান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা পাইতেছে। "শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।/ 'বউ কথা কও' বলি কাঁদ পথে পথে॥" (কঙ্ক ও লীলা, পৃ. ৩০২)। এইরকম অনেক পদ আছে, পাঠক নিজে পড়িয়া দেখিবেন।

বস্তুত এই গীতিকাগুলি পড়ার পর হইতে পূর্ব-মৈমনসিংহ আমার মানসপটে পর পর ছবির ওপর ছবি আঁকিয়া ফেলিয়াছে। কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিশনের পূর্ব সীমান্তে আরালিয়া গ্রামে আমাদের অন্যতম কাব্যনায়ক চাঁদ বিনোদের শ্বশুরবাড়ি, এইখানে মলুয়ার পদ্মের পাপড়ির মতো দুটি চোখের সঙ্গে বিনোদের ভ্রমরকৃষ্ণ দৃষ্টির প্রথম শুভমিলন হয়—অপরাহ্ণ কাল, সূত্যা নদীর তীরস্থ বক্‌শাইয়া গ্রামে সম্ভবত চাঁদ বিনোদের বাড়ি ছিল। তথা হইতে চার-পাঁচ মাইল দূরবর্তী আরালিয়াতে আসিয়া তৃণশষ্পময়ী বনভূমির উপান্তে পুষ্করিণীর পাড়ে কদম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া "ঝাড় জঙ্গালে ঘেরা" মান্দারের বেড়ায় বেষ্টিত রম্ভাবন ও জলের নীলাভ শোভা দেখিতে দেখিতে বাপীস্পর্শ শীতল বায়ুর হিল্লোলে চাঁদ বিনোদ ঘাটের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তখন মলুয়ার মেঘের মতো নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল তাহার পায়ে লুটাইতেছিল ও তাহার কলসীতে জল ভরিবার শব্দ শুনিয়া মেঘগর্জন মনে করিয়া কুড়া পাখি চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই কুড়ার ডাক আসন্ন বর্ষার আবেশ আনয়ন করিয়াছিল। এই আরালিয়া গ্রামের ১৩/১৪ মাইল উত্তরে ধলাই বিল, 'বিস্তার ধলাই বিল পদ্মফুলে ভরা"; এই বিলের ৭/৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত জাহাঙ্গীরপুর

হইতে জাহাঙ্গীর দেওয়ান ধনু নদীর একটি উপশাখা বাহিয়া একসময় দ্বিপ্রহর বেলা ধলাই বিলে কুড়া শিকার করিতে আসিয়াছিলেন—সঙ্গে মলুয়া। সহসা ঝুপঝাপ শব্দে তরুণী নর্তকীর ন্যায় ক্ষিপ্রবেগে কয়েকখানি পানসি আসিয়া দেওয়ান সাহেবের তরীখানি ঘিরিয়া লইল। মলুয়ার ভ্রাতৃগণের সেই সব পানসি নৌকা; পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত পাইলে বিহঙ্গী যেমন স্ফূর্তিতে উড়িয়া যায়—মলুয়া তেমনই অপূর্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রাতাদের একটা নৌকায় লাফাইয়া পড়িল—তখন "আট দাঁড়ী নৌকা" পদ্মবন ভাঙ্গিয়া নক্ষত্রবেগে আরালিয়ার অভিমুখে রওনা হইল। এগুলি সত্য ঘটনা, অথচ অপূর্ব কবিত্বময়। সেই আরালিয়া, সেই ধলাই বিল জাহাঙ্গীরপুর ও সুত্যা নদী এখনও আছে এবং তথাকার চাষারা তাহাদের আদর্শ রমণী মলুয়ার কথা এই দু-তিনশত বৎসরের মধ্যে একদিনও ভুলিতে পারে নাই—তাহারা এখনও নানা বাদ্যযন্ত্রসহকারে সাশ্রু নেত্রে সেই গীত গাহিয়া থাকে।

গিরিনদীর ন্যায় দুর্জয়শক্তিশালিনী, প্রেমের সীমাহীন আকাশের নৃত্যশীলা ময়ূরী মহুয়া জৈন্তা পাহাড় হইতে ছুটিয়া বামুনকান্দা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই গ্রাম নেত্রকোনা সাব-ডিভিশনে 'তলার হাওরের' নিকট। বামুনকান্দা, উলুয়াকান্দা, বেদের দীঘি, ঠাকুর বাড়ির ভিটা এখন উচ্চ ভূখণ্ডে পরিণত; শুধু নামে মাত্র তাহাদের পরিচয়, জনমানবশূন্য। হতভাগ্য ব্রাহ্মণ যুবরাজের স্মৃতিতে এখনও নিকটবর্তী স্থানগুলি ভরপুর। জৈন্তা পাহাড়ের অদূরে কংস নদীর তীরভূমির রক্তিম পুষ্পারণ্য, যেখানে মহুয়া ও নদের চাঁদ কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন, সেই জঙ্গলময় দৃশ্য এখনও পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোরগঞ্জ সাবডিভিশনে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের আর এক তীর্থ পাতুয়ারী গ্রাম, এইখানে দ্বিজবংশীদাস ও তাঁহার গুণবতী কন্যা চন্দ্রাবতী একত্রে "মনসার ভাসান" রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতী তপস্বিনী, সহসা চন্দ্রিকাভূষিত শারদাকাশের গায়ে যেরূপ বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, এই পরম নিষ্ঠাবতী যোগশান্ত পূজারিণীর শুদ্ধ চিত্তে সেইরূপ একবার সাংসারিক প্রেমের একটা আকস্মিক লহরী খেলিয়া গিয়াছিল। নিরাশ জীবনকে শিবের পায়ে উৎসর্গ করে চন্দ্রাবতী যে মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন, যাহার গাত্রে রক্তমালতীফুলের রস দিয়া উন্মত্তবৎ জয়চন্দ্র তাঁহার শেষ নিবেদন অনলবর্ষী অনুতাপের ভাষায় লিখিয়া ফুলেশ্বরীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন—সেই জরাজীর্ণ মন্দিরের অবশেষ নাকি ফুলেশ্বরীর তীরে এখনও বিদ্যমান। এই পাতুয়ারী গ্রামের পাশেই 'জালিয়ার হাওর', এইখানে বংশীদাস দস্যু কেনারাম কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং নলখাগড়ার বনাকীর্ণ এই হাওরেই বংশীদাসের গলায় অপূর্ব মনসাসংগীতে প্রস্তর কঠিন দস্যুর মন গলিয়া গিয়াছিল। ফুলেশ্বরী নদীর গর্ভে অনুতপ্ত দস্যু তাহার বহু বৎসর-সঞ্চিত রক্তমাণিক্যপূর্ণ ঘড়াগুলি বিসর্জন দিয়া স্বীয় কোষনির্মুক্ত অসিদ্বারা আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিল।

কেন্দুর নিকটবর্তী বিপ্রগ্রাম (বিপ্রবর্গ) কবি কঙ্কের নিবাসভূমি নেত্রকোণার দক্ষিণে। এই গ্রামের নিকটবর্তী রাজী (রাজেশ্বরী) নদীর তীরে কঙ্ক বাঁশি বাজাইয়া

গরু চরাইতেন এবং যখন অপরাহ্নে বিশীর্ণ পদ্মপ্রভ শ্রমকাতর মুখে গর্গাশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন, তখন ফোলা চোখে দেখিতে পাইতেন, কুটিরবাসিনী লীলা উৎকণ্ঠায় তালপত্রের ব্যজনীহস্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রাজী নদীর তীরে এক হস্তে লীলার চিতা জ্বালাইয়া অপর হস্তে চোখের জল মুছিতে মুছিতে গর্গ সহসা প্রত্যাগত কঙ্ককে দেখিয়া দাবদগ্ধ তরুর ন্যায় শোকে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন এবং "মৃত্যুকালে তোমার নামই লীলার শেষ কথা" এই বলিতে বলিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নেত্রকোণায় কংস নদীর দক্ষিণে বৃহৎ "বাঘরার হাওর" সোনাই-এর শোচনীয় মৃত্যুর কথার সঙ্গে অপরিহার্যরূপে সংশ্লিষ্ট। সোনাই-এর ন্যায় কত রূপসী সাধ্বীর সর্বনাশ করে 'বাঘরা' এই বিস্তৃত বিলটি দেওয়ান সাহেবদের নিকট হইতে লাখেরাজ শর্তে দান পাইয়াছিল, তাহারই নামে কলঙ্কিত হইয়া এই বিল এখনও পরিচিত। দীঘলহাটি গ্রামটির এখন অস্তিত্ব নাই, এই গ্রামের সন্নিহিত নদীর তীরে বিস্তৃত কেয়াবনের নিকট হইতে দেওয়ান ভাবনার নিযুক্ত লোকেরা রোরুদ্যমানা সোনাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। হালিয়ারা (হুলিয়া) গ্রামটি নন্দাইল হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইহার সাত মাইল উত্তরে রঘুপুরে দয়াল নামে কোনো রাজা রাজত্ব করিতেন। এই কথা লিখিবার পরে যাহা জানিতে পারা যাইতেছে তাহাতে "হালিয়াঘাট" নামক স্থানকেই 'হুলিয়া' বলিয়া মনে হইতেছে। এই গ্রামের নিকটবর্তী বৃহৎ জঙ্গলে নাকি এখনও বিস্তৃত রাজপ্রাসাদের চিহ্ন পড়িয়া আছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই প্রাসাদের অধিপতি ছিলেন কেশর রায়, লৌকিক উচ্চারণে 'কাছার রায়'। এই কেশর রায় দয়াল রাজার কেউ কি-না জানা যায় নাই। হয়তো এই রাজপ্রাসাদেই নিদান কারকুনের বিচার হইয়াছিল এবং কমলা মহিলাজনোচিত লজ্জাশীলতা ও নারীমর্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনি যেরকম সরল কথায় বলিয়াছেন, তাহা করুণ কবিত্বে উপলুপ্ত, নির্ভীকতায় ভরপুর এবং সংযম-সহিষ্ণুতার সারস্বরূপ। হালুয়াঘাট মৈমনসিংহ হইতে ত্রিশ মাইল উত্তরে।

সুতরাং পূর্ব-মৈমনসিংহের ঝিল ও তড়াগ, সর্পব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যভূমি, কুড়াপাখির গুরুগম্ভীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, 'বারদুয়ারী ঘর' ও সানবাঁধা পুকুরঘাট, স্বর্ণপ্রসূ শালী-ধান্যক্ষেত্র ও সুরভিপূর্ণ কেয়াবন এই গাথাগুলির কল্যাণে আমাদের একান্ত পরিচিত ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। টেম্‌স নদীর সুড়ঙ্গা, নটারডেম, রোমের ভাটিকান প্রভৃতি দেখতে আমাদের আর ততটা আগ্রহ নাই, মলুয়ার পদাঙ্কলাঞ্ছিত আরালিয়া গ্রাম এবং বংশদণ্ডের ঊর্ধ্বে রজ্জুর উপর নর্তনশীলা মহুয়া নর্তকীর অপূর্ব নর্তনের স্মৃতিবাহী বামুনকান্দা প্রভৃতি পল্লী দেখিতে যতটা ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। এই সকল স্থানে বাঙ্গালির ঘরের শোভা শত শতদলের মতো ফুটিয়া জগৎকে যে সুষমা দেখাইয়াছিল, আমাদের পোড়া দেশের সেই অমর আলেখ্য এতকাল আমরা তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছি। এড্রোমেকি, মিসেলেণ্ডা, ডেসডেমনা ও নোরা আমাদের হৃদয়ে যে সুর জাগাইতে পারিবে না, তাহা মহুয়া ও মলুয়া জাগাইবে, ইহাতে আমার

সংশয় নাই। আমাদের ললনাকুল ফুলদলকোমল হইয়াও প্রেমের তপস্যায় কীরূপ বজ্রকঠোর, তাহা এই সকল গাথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবে। মৈমনসিংহের পাড়াগাঁগুলি এই গীতিকাসমূহের গুণে আমার চক্ষে শ্রেষ্ঠ তীর্থমর্যাদার দাবি করিতেছে।

ময়মনসিংহে অনেক জমিদার আছেন, তাঁহাদের কেউ কি এই সকল অমর-অমরীর লীলাভূমি—এই পল্লীগুলিতে কোনো স্মৃতিচিহ্নের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের দেশের প্রতি জগতের শ্রদ্ধাকর্ষণের ভিত্তি গড়িয়া দিতে পারেন না? হায়রে! আমাদের দেশের সমস্ত ধনরত্ন সমুদ্রপথে শত শত যানারোহণ করিয়া পশ্চিমে যাইতেছে, যাহা অবশিষ্ট কিছু আছে তাহাও বিলাস ও পর-মনোরঞ্জনের শতচেষ্টায় সেই পশ্চিমের অভিমুখী হইয়া আছে। আমাদের দেশে এখন কোনো কীর্তিপ্রতিষ্ঠা দূরপরাহত স্বপ্ন। বিলাতে এইরূপ উপলক্ষ্যে প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার জন্য শত জনশূন্য স্থান বিশাল নগরীতে পরিণত হইয়া তীর্থযাত্রীদের আশ্রমে পরিণত হইতেছে। স্কটের কবিতায় লক্‌লেমন, লক্‌কেট্রিন এবং পার্থসায়ার প্রভৃতি স্থান শত কীর্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া তীর্থযাত্রীর কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তো সকল বিষয়েই তাঁহাদের সঙ্গে সক্ষমতা করিতে চাই, তাহাদের স্বদেশপ্রেমের কণিকা যদি আমরা লাভ করিতাম, তবে এই বিরাট কর্মশালায় কর্মী হইয়া জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতাম, কেবল বক্তৃতা ও অসার বিষয় লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে থাকিতাম না। আর এই সকল গীতিকার কথা কি বলিব? এ যে অপ্রত্যাশিত আনন্দ। বঙ্গভারতী বৈষ্ণব গীতিকার রক্ত শতদলে বসিয়াছিলেন, —এবার তাঁহাকে পূর্ববঙ্গের শুভ্র কুমুদদলাসীনা দেখিলাম।

৮

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে গত তিন-চার বৎসর যাবৎ অক্লান্ত উদ্যমে নানা স্থান পর্যটন করিয়া এই পালাগুলির উদ্ধার করিয়াছেন; তিনি নানা স্থানে ঘুরেছেন, আমার চক্ষু দুইটি তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে, আমি প্রতিপদে তাঁহাকে দীর্ঘ উপদেশ-সম্বলিত পত্র লিখিয়া সহায়তা করিয়াছি,—কীভাবে কোন্ পালা সংগ্রহ করিতে হইবে, কোন্ কোন্ গাথার ঐতিহাসিক মূল্য কী,— কোন্‌গুলির উদ্ধার আপাতত ক্ষান্ত রাখিয়া কোন্ দিকে বেশি চেষ্টা করিতে হইবে, কোথায় কোন্ পালার সন্ধান হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমার মন্তব্য লিখিয়া সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহাকে জানাইয়াছি, এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ দেওয়ার জন্য গত বৎসর তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলাম। তিনি কয়েক দিন আমাদের এখানে থাকি এই সংগ্রহকার্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া অবহিত হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহাকে ক্রমাগত লিখিয়া লিখিয়া আমি গীতোক্ত গ্রামগুলির স্থান নির্দেশ করিয়া লইয়াছি। সার্‌ভে জেনারেলের অফিসের ম্যাপে 'হাওর' ও নদীগুলির অনেকেরই নাম নাই; যে সমস্ত গ্রাম বিলুপ্ত হইয়াছে, অথচ জনশূন্য ভিটাগুলির নামেমাত্র স্থানীয় পরিচয় আছে, তাহা উক্ত আফিসের মানচিত্রে নাই। আমি পূর্ব-মৈমনসিংহের সমস্ত

গ্রামের নাম-সম্বলিত মানচিত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া চন্দ্রকুমারের সাহায্য গ্রহণ-পূর্বক যে মানচিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। এই মানচিত্র দ্বারা গীতোক্ত স্থানগুলি নখদর্পণের ন্যায় পরিষ্কাররূপে বোঝা যাইবে। চন্দ্রকুমার দে প্রেরিত মহুয়ার পালায় কতকগুলি গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশৃঙ্খলভাবে দেওয়া ছিল। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন তেমনই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি। এই তিন-চার বৎসর যাবৎ আমি এই গাথাগুলির অনুবাদ, টীকা ও টিপ্পনী লেখা ও ভূমিকা রচনা ছাড়া সংগ্রহ সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ দিয়াছি এবং প্রতি পালাটি বিশেষ বিশেষ সর্গে বিভক্ত করিয়াছি। গান গাওয়ার সময়ে গায়কেরা যে বিরাম গ্রহণ করেন, লিখিত রচনায় সেইরূপ বিরাম লওয়ার অবকাশ নাই। সুতরাং ওইভাবে বিভাগ না করিলে গাথাগুলির পয়ার নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া যায়।

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় সুদীর্ঘ ইংরাজি ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠকেরা পড়িয়া সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন, বাঙ্গালা ভূমিকায় সেই সকল কথা অতি সংক্ষেপে লিখিলাম, কিন্তু ইংরাজি ভূমিকায় যাহা নাই, এমন অনেক কথাও এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। এই দুই ভূমিকা পড়িয়া পাঠক এই গাথাগুলি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন। প্রথম সংখ্যায় মানচিত্র, ইংরাজি সাধারণ ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ইংরাজি অনুক্রমণিকা, ইংরাজি অনুবাদ ও ১১ খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। এই (দ্বিতীয়) সংখ্যায় ভূমিকা ও টীকাসমেত মূল দেওয়া হইল। প্রথমখণ্ডে এই দুই সংখ্যায় মাত্র ১০টি গাথা দিলাম। যথা—

১. মহুয়া	২. মলুয়া	৩. চন্দ্রাবতী	৪. কমলা
৫. দেওয়ান ভাবনা	৬. দস্যু কেনারাম	৭. রূপবতী	৮. কঙ্ক ও লীলা
৯. কাজলরেখা	১০. দেওয়ানা মদিনা		

১.

মহুয়া

নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি ৩০০ বৎসর পূর্বে এই গান রচনা করেন। প্রবাদ এই, দ্বিজ কানাই নমশূদ্র-সমাজের অতিহীনকূল-জাতা এক সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হইয়া বহু কষ্ট সহিয়াছিলেন, এজন্যই 'নদের চাঁদ' ও 'মহুয়া'র কাহিনিতে তিনি এরূপ প্রাণঢালা সরলতা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। 'নদের চাঁদ' ও 'মহুয়ার গান' একসময়ে পূর্ব-মৈমনসিংহের ঘরে ঘরে গীত ও অভিনীত হইত। কিন্তু উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কঠোর শাসনে এই গীতিবর্ণিত প্রেম দুর্নীতি বলিয়া প্রচারিত হয় এবং হিন্দুরা এই গানের উৎসাহ দিতে বিরত হন। এখন বহুকষ্টে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। গীতিকার প্রথম ১৬ ছত্রের স্তোত্র জনৈক মুসলমান গায়কের রচিত। গীতি বর্ণিত ঘটনার স্থান নেত্রকোণার নিকটবর্তী। খালিয়াজুরি থানার নিকট—রহমৎপুর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে "তলার হাওর" নামক বিস্তৃত 'হাওর'—ইহারই পূর্বে বামনকান্দি, বাইদার দীঘি, ঠাকুরবাড়ির ভিটা, উলুয়াকান্দি প্রভৃতি স্থান এখন জনমানবশূন্য হইয়া রাজকুমার ও মহুয়ার স্মৃতি বহন করিতেছে।

এখন তথায় কতকগুলি ভিটামাত্র পড়িয়া আছে। কিন্তু নিকটবর্তী গ্রামসমূহে এই প্রণয়যুগ্মের বিষয় লইয়া নানা কিংবদন্তী এখনও লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। যে কাঞ্চনপুর থেকে 'হোমরা" বেদে মহুয়াকে চুরি করিয়া লইয়া যায়—তাহা ধনু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্দিকোনা পোষ্টাফিসের অধীন মস্‌কা ও গোরালী নামে দুইটি গ্রাম আছে—মস্‌কা গ্রামের সেক আসক আলী ও উমেশচন্দ্র দে এবং গোরালীর নসুসেকের নিকট হইতে এই গানের অনেকাংশ সংগৃহীত হয়। মস্‌কা গ্রামে মহুয়ার পালা গাহিবার জন্য এখনও নাকি একটি দল আছে। এক সময়ে যে গাথা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শত শত পল্লীর বক্ষস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহা একটা ভগ্নদণ্ডে পর্যবসিত। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মার্চ আমি চন্দ্রকুমারের নিকট হইতে এই গাথা পাইয়াছি। চন্দ্রকুমার দে যেভাবে গীতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল, গোড়ার গান শেষে আর শেষের গান গোড়ায় এইভাবে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল, আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলো পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি।

এই গানের মোট ৭৫৫ ছত্র পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহা ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। মহুয়ার গান পড়িয়া আমাদের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোনাল্ডসে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন।

২.

মলুয়া

গ্রন্থকারের নাম নাই। গোড়ায় চন্দ্রাবতীর একটা বন্দনা আছে, এজন্য কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পালাটিই চন্দ্রাবতীর রচনা। আমার নিকট এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রাবতী সম্ভবত ১৬০০ খ্রি. অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়ে জঙ্গালবাড়ির দেওয়ান-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খাঁ সবে মাত্র পূর্ব-মৈমনসিংহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তখনও "নজর তরপের ছেলেরা" আবির্ভূত হইয়া পরস্ত্রীহারক দস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। আরও ১০০ বৎসর পরে এই ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। জাহাঙ্গীর দেওয়ান কোন্ বংশোদ্ভূত তাহা জানিবারও উপায় নাই। গীতি-বর্ণিত আরালিয়া গ্রাম ভাদৈর নদীর তীরবর্তী এবং কিশোরগঞ্জ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে, ইহারই ৪/৫ মাইল দূরে "সূত্যা" নদীর কূলে চাঁদ বিনোদের বাড়ি ছিল, সূত্যা নদী আরালিয়া হইতে ৪/৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু সেই গ্রামটির নাম নাই। ৯৬ পৃষ্ঠায় (১১ ছত্র) "বংশাইয়া সতী কন্যা হইল অবতার" পদটির "বংশাইয়া" শব্দটিতে গ্রামের নাম বুঝাইতে পারে, "বংশাইয়া" শব্দের ভিন্নার্থ (অর্থাৎ "সেই বংশে") হওয়াও অসম্ভব নয়। বংশাইয়া নামক কোনো গ্রাম আরালিয়ার নিকটে নাই, কিন্তু উক্ত গ্রামের ৪/৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে "বকশাইয়া" নামক এক গ্রাম আছে। লিপিকাগণ অজানিত দেশের নাম লইয়া প্রায় লিখিতে ভুল করিয়া থাকেন, সুতরাং 'বকশাইয়া'র 'বংশাইয়া'-রূপ গ্রহণ আশ্চর্য্য নহে। গীতোক্ত "ধলাই বিল" আরালিয়া গ্রামের ৩০ মাইল উত্তরে। জাহাঙ্গীরপুর গ্রাম আরালিয়া হইতে ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। সম্ভবত ধনু নদীর শাখাপ্রশাখা বাহিয়া দেওয়ান

জাহাঙ্গীর মলুয়ার সঙ্গে কুড়া শিকার করিতে ‘পদ্মোৎপলঝষাকুল’ ধলাই বিলে আসিয়াছিলেন।

‘মলুয়া’ পালাটি চন্দ্রবাবু জাহাঙ্গীরপুরের উপকণ্ঠস্থিত ‘পদমশ্রী’ গ্রামের পাষাণী বেওয়া, রাজীবপুরের সেখ কাঞ্চা, মঙ্গালসিদ্ধির নিদান ফকির, খুরশীমলীর সাধু ধূপী, সাউদ পাড়ার জামালদিসেক, দুলাইল-নিবাসী মধুর রাজ এবং পদমশ্রীর দুখিয়া মালের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গাথার মোট ছত্রসংখ্যা ১২৪৭, আমি ইহাকে ১৯ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর এই গীতিকা আমার হস্তগত হয়।

৩.

চন্দ্রাবতী

নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত। এই কবি রঘুসূত, দামোদর প্রভৃতি অপর অপর কয়েকজন কবির সহযোগে ‘কঙ্ক ও লীলা’ নামে আর একটি গাথা প্রণয়ন করেন। চন্দ্রাবতী সুবিখ্যাত মনসাভাসান লেখক কবি বংশীদাসের কন্যা। পিতা ও কন্যা একত্র হইয়া মনসাদেবীর ভাসান ১৫৭৫ খ্রি. অব্দে রচনা করিয়াছিলেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী বাঙ্গালা ভাষায় একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহা পূর্ব-মৈমনসিংহে মহিলা সমাজে এখনও ঘরে ঘরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। তাহার একখানি আমাদের সংগ্রহের মধ্যে আছে। জয়চন্দ্রকে ভালোবাসিয়া এই সাধ্বী ব্রাহ্মণ ললনা যে মর্মন্তুদ কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং সেই ঘোর পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়া তিনি কীরূপ বিশুদ্ধ সোনার ন্যায় নির্মল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা এই গাথাটিতে বর্ণিত আছে। বঙ্গাসাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই চন্দ্রাবতীর পরিচয় ভালো করিয়া জানেন। বংশীদাসের পিতার নাম ছিল যাদবানন্দ এবং মাতার নাম ছিল অঞ্জনা। চন্দ্রাবতী নিজে বংশ ও গৃহপরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—

ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী-নদী বহি যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য ঘরে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পাল্লায় তালপাতার ছাউনী॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়॥
দ্বিজবংশী বড় হৈল মনসার বরে।
ভাসান গাইয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান-চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি॥
ভাসান গাইয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল-কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়াতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তাঁর ঘরে জন্ম নিলা চন্দ্রা অভাগিনী॥

সদাই মনসা-পদ পূজি ভক্তিভরে।
চাল-কড়ি কিছু পান মনসার বরে॥
দূরিতে দারিদ্র্যদুঃখ দেবীর আদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে দিলা উপদেশ॥
সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যাঁর কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥
মনসা দেবীরে বন্দি জুড়ি দুই কর।
যাঁহার প্রসাদে হৈল সর্ব্ব দুঃখ দূর॥
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁহার কারণে দেখি জগৎ সংসার॥
শিব-শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী-নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি॥
বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥

দেখা যাইতেছে জয়চন্দ্রের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে এবং চন্দ্রার আজীবন কুমারীব্রত গ্রহণের পর এই রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। কারণ এই গাথায়-ই আছে, মনে শান্তি স্থাপনের জন্য বংশী চন্দ্রাকে রামায়ণ লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যদিও চন্দ্রার এই বন্দনায় সেই প্রেমঘটিত কথার কোনো উল্লেখ নাই, তথাপি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ যে চলিয়া গিয়াছিল "চন্দ্রা অভাগিনী" কথাটাতেই তাহার কিছু আভাস আছে। তিনি যে পিতৃগৃহের গলগ্রহ হইয়া তাঁহাদের চিরকষ্টদায়ক হইয়া থাকিতেন—ঐ পদের পূর্ব-ছত্রে সে কথাও রহিয়াছে। এই গাথার পূর্ণ আলোকপাতে চন্দ্রার করুণ আত্মবিবরণীটি আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। চন্দ্রাবতীর পিত্রালয় ফুলেশ্বরী নদীর তীরস্থ পাতুয়ারী গ্রামে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যে মন্দিরের গাত্রে জয়চন্দ্র রক্তমালতীপুষ্পের রস দিয়া বিদায়পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ফুলেশ্বরীর তীরে নিষ্ঠাবতী রমণীর নৈরাশ্যকে ভগবদ্‌ভক্তিতে উজ্জ্বল করিয়া এখনও জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। জয়চন্দ্রের বাড়ি ছিল সুন্ধ্যা গ্রামে, তাহা পাতুয়ারীর অদূরবর্তী ছিল। নয়ানচাঁদ ঘোষ কোন্ সময়ে এই গাথাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে রঘুসূত কবি যিনি ইঁহার সঙ্গে "কঙ্ক ও লীলা" লিখিয়াছিলেন, তিনি ২৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। রঘুসূতের বংশলতায় এই অনুমান সমর্থিত হয়। পাতুয়ারী গ্রামটি কিশোরগঞ্জ হইতে বেশি দূরে নহে। এই গাথাটির ছত্রসংখ্যা মোট ৩৫৪। ইহাকে আমরা ১২ অঙ্কে ভাগ করিয়া লইয়াছি।

৪.

কমলা

ভণিতায় কবির নাম দ্বিজ ঈশান পাওয়া যাইতেছে। 'হুলিয়া' নামক কোনো গ্রাম পূর্ব-মৈমনসিংহে পাইলাম না। তবে "হালিয়ারা" গ্রামটি নন্দাই হইতে বেশি দূরে

নহে। এই হালিয়ার কাছে রঘুপুর আছে। এই হালিয়ারা 'হুলিয়া' হইতে পারে, কিন্তু পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় বলিতেছেন, মৈমনসিংহ সদর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত হালিয়াঘাট নামক স্থানই খুব সম্ভব কাব্যবর্ণিত হুলিয়া। কারণ তাহার পার্শ্ববর্তী বৃহৎ জঙ্গালে বিস্তৃত রাজবাড়ি ও গড়াখাই প্রভৃতি চিহ্ন আছে। ২/৩ শত বর্ষ পূর্বে তথায় কেশব রায় নামক এক রাজবৈভবশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার বিধবারমণী শত্রু কর্তৃক গৃহে আক্রান্ত হইলে প্রাসাদসংলগ্ন দীঘির জলে প্রাণত্যাগ করেন। এই কেশর রায় "দয়াল রাজা"র বংশধর হইতে পারেন। কেন্দুয়ার নিকটবর্তী কোনো গ্রামবাসিনী তিন-চারটি রমণীর নিকট হইতে চন্দ্রকুমার এই গাথাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালা ১৩২৮ সনের ১৯শে আষাঢ় আমার হস্তগত হয়। আমি গাথাটিকে ১৭ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি, ছত্রসংখ্যা মোট ১৩২০।

৫.

দেওয়ান ভাবনা

দেওয়ানের অত্যাচারের কথা যে সকল গীতিকায় বর্ণিত আছে, তাহাদের কোনটিতেই কবির নাম পাওয়া যায় না। এই সম্বন্ধে কবিদের সতর্কতা অকারণ নহে।

দেওয়ান ভাবনা মোট ৩৭৪টি ছত্রে সম্পূর্ণ,—আমি গানটিকে ৯ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি। এই গীতিকা ২০০/২৫০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। গীতি বর্ণিত 'বাঘরা'র নামে তদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ একটির হাওর পরিচিত। প্রবাদ এই, সোনাই-এর মতো বহু সুন্দরীর সন্ধান দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ বাঘরা নামক এক গুপ্তচর (সিন্ধুকী) দেওয়ানদের নিকট হইতে এই বিস্তৃত 'হাওর' লাখেরাজস্বরূপ পুরস্কার পাইয়াছিল। 'বাঘরার হাওর' নেত্রকোণার দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। বোধহয় 'দীঘলহাটী' গ্রামের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত হাওরের নিকটবর্তী 'ধলাই' নদীর তীরে 'দেওয়ান পাড়া' নামক একটি গ্রাম আছে,—সম্ভবত এইখানেই 'দেওয়ান ভাবনা'র আবাস ছিল।

'দেওয়ান ভাবনা' ১৯২২ খ্রি. অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রকুমার দে আমাকে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেন্দুয়ার নিকটবর্তী কোনো কোনো স্থানের মাঝিদের মুখে এই গান তিনি শুনিয়াছিলেন। নৌকা 'বাছ' দেওয়ার সময়ে এখনও তাহারা এই গান গাহিয়া থাকেন।

৬.

দস্যু কেনারাম

চন্দ্রাবতী প্রণীত। চন্দ্রাবতীর পরিচয় তৎসম্বন্ধীয় গাথার বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেনারামের বাড়ি ছিল বাকুলিয়া গ্রামে। নলখাগড়ার বনসমাকীর্ণ সুপ্রসিদ্ধ "জালিয়ার হাওর" কিশোরগঞ্জ হইতে ৯ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে, এইখানেই বংশীদাসের সঙ্গে কেনারামের সাক্ষাৎ হয়। এই গীতোক্ত ঘটনা ১৫৭৫ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, প্রেমহতা চন্দ্রা জয়চন্দ্রের শব দর্শন করার অল্পকাল পরেই হৃদরোগে লীলা সংবরণ করেন।

ফুলেশ্বরী নদীর গর্ভেই কেনারাম তাহার মহামূল্য ধনরত্ন বিসর্জন দিয়াছিল। এই গীতের মোট ছত্র সংখ্যা ১০৫৪, তাহার মধ্যে অনেকাংশ মনসাদেবীর গান, সেগুলি অপরাপর কবির লেখা। সুতরাং আমি গাথাটির অনেকাংশ বর্জন করিয়াছি। মনসাদেবীর গানের মধ্যে যেইখানে চন্দ্রাবতীর লেখা কেনারামের বিবরণ আছে, সেই সেই স্থান আমি নক্ষত্রচিহ্নিত করিয়াছি।

৭.

রূপবতী

এই গাথাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কবির নাম পাওয়া যায় নাই। ছত্রসংখ্যা ৪৯৩। ১৯২২ খ্রি. অব্দের ৩০শে মার্চ ইহা আমার হস্তগত হয়। আমি ইহাকে ৭ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি। এই গাথার সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য ইংরেজি ভূমিকায় দিয়াছি।

৮.

কঙ্ক ও লীলা

এই গাথার রচক ৪ জন—দামোদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া। রঘুসূত ২৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিল, ইহারা জাতিতে পাটুনি বহু পুরুষ যাবৎ ইহারা গায়কের ব্যবসা করিতেছে, ইহারা এইজন্য 'গায়েন' ('ময়মনসিংহে গাইন') উপাধিতে পরিচিত। রঘুসুতের নিম্নতম বংশধর, রামমোহন গায়েনের পুত্র শিবু গায়েন 'কঙ্ক ও লীলা'র পালা অতি উৎকৃষ্টভাবে গাহিতে পারিত। ইহাদের বাড়ি নেত্রকোণায় কেন্দুয়া থানার অধীন "আওয়াজিয়া" গ্রাম। উৎকৃষ্ট পালাগায়ক বলিয়া ইহারা গৌরীপুরের জমিদারদিগের নিকট হইতে অনেক নিষ্কর জমি পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছে। ২০/২১ বৎসর হইল শিবু গায়েনের মৃত্যু হইয়াছে। কবিকঙ্ক পূর্ববঙ্গের সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইনি বিপ্রবর্গ বা বিপ্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রাম কেন্দুয়ার অদূরবর্তী রাজেশ্বরী বা রাজী নদীর তীরে। বিপ্রবর্গের নিকট ধলেশ্বরী বিলের সন্নিকট এখনও পাঁচপীরের একটা জায়গা আছে এবং তথায় "পীরের পাথর" নামক একটা পাথর আছে গীতোক্ত পীর এইখানে আড্ডা করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কের রচিত 'মলুয়ার বারমাসী' এক সময়ে পূর্ব-মৈমনসিংহের কাব্যরসের খনি ছিল। এখনও তাহার দু-একটি গান গ্রাম্যকৃষকের মুখে শোনা যায়। এখন পর্যন্ত আমরা পালাটি সংগ্রহ করিতে পাবি নাই। কিন্তু চন্দ্রকুমারের বহু চেষ্টায় কবিকঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' খানি সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিদ্যাসুন্দরের মুখবন্ধে কবি তাঁহার পিতামাতার নাম, তাঁহার চণ্ডাল পিতা ও চণ্ডালিনী মাতার নাম ও গর্গের কথা লিখিয়াছেন। কবিচতুষ্টয় প্রণীত এই গাথায় তাঁহার বাল্যলীলার যে ইতিহাস আছে তিনি নিজেও সেই কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। পল্লীগাথাগুলির ঐতিহাসিকত্বের এটা অন্যতম প্রমাণ। খুব সম্ভব কঙ্ক চৈতন্যের সমকালবর্তী ছিলেন।

"কঙ্ক ও লীলা" ১০১৪ সংখ্যক ছত্রে পূর্ণ। আমি এই গাথাটিকে ২৩ অঙ্কে ভাগ করিয়া লইয়াছি। কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই বাঙ্গালা 'বিদ্যাসুন্দর'গুলির মধ্যে

প্রাচীনতম। প্রাণারাম কবি 'বিদ্যাসুন্দর'গুলোর যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে নিম্‌তাবাসী কৃষ্ণারামের বিদ্যাসুন্দরকে 'আদি বিদ্যাসুন্দর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি পূর্ববঙ্গবাসী কবিদের কথা অবগত ছিলেন না।

৯.

কাজলরেখা

এটি একটি রূপকথা। এই গীতিগুলি সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় ভূতপূর্ব লাটবাহাদুর লর্ড রোনাল্ডসে, স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, ভারতীয় কলাশাস্ত্রবিশারদ স্টেলা ক্র্যামরিচ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যে সব উচ্চপ্রশংসাযুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এবং অপরাপর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রথম খণ্ডে ইংরেজি ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। লাট রোনাল্ডসে এই পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

১০.

দেওয়ান মদিনা

বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের সম্বন্ধে গাথা। এই গানে ধনু নদীর উল্লেখ আছে, দীঘলহাটি গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার লেখক মনসুর বাইতি সম্বন্ধে নাম ছাড়া আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কবি যে নিরক্ষর ছিলেন, তাহা যেমন তাঁহার কাব্যপাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি যে প্রকৃত কবিত্বশালী, করুণরসসৃষ্টিতে সুপটু ছিলেন, তাহাও তেমনই অবধারণ করা যায়। মদিনার স্বামীর ভালোবাসায় অগাধ বিশ্বাস—যাহা তালাকনামা পাইয়াও দীর্ঘকাল টলে নাই—সে অগাধ বিশ্বাসে যেদিন হানা পড়িল, সেদিন সে মৃত্যুশয্যাশায়ী হইল। তাহার অপূর্ব সংযম, যাহাতে এরকম কৃতঘ্নতায়ও স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথা সে বলিতে পারিল না, এই অপূর্ব প্রেম ও চিত্তসংযম কোন্ উচ্চ লোকের, পাঠক তাহা ধারণা করুন। চাষার ভাষায় চাষার লেখা বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না।

মৈমনসিংহ গীতিকা

তারাপদ ভট্টাচার্য

টপ্পার ন্যায় মৈমনসিংহ-গীতিকাও বিশেষ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক মনের সাহিত্য। ইহাও বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের কবিতা। নামে 'গীতিকা' হইলেও ইহা আসলে গীতি-কবিতা বা গান নহে, তাছাড়া টপ্পার ন্যায় ভাবসর্বস্ব নহে, নাগরিক সাহিত্যও নহে। এই গীতিকা আসলে গ্রাম্য আখ্যায়িকামূলক 'ব্যালাড' বা গাথা-কবিতা। টপ্পার মননশীলতা ইহার মধ্যে আশা করা অনুচিত। গীতিকার দৃষ্টিভঙ্গিও আধুনিক, তবে এই আধুনিকতা অন্যপ্রকার। গীতিকার গঠনভঙ্গিতে আধুনিক মনোবৃত্তির পরিচয় আছে। আধুনিক বাঙ্গালীমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহজীবনের তথা সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রাচীন বাঙ্গালীর জীবনে সময়ের মূল্যবোধ দেখা যায় না। অধ্যাত্ম-জীবনে যাহাই হউক, সাংসারিক জীবনে সাধারণ বাঙ্গালী ছিল একান্তভাবে আলস্যপরায়ণ ও জড়তাগ্রস্ত। তৎকালীন রাজা,জমিদার ও বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের তো কথাই নাই, দরিদ্র কৃষক-জীবনেও দেখা গিয়াছিল স্থাবরতা ও স্থবিরতা। শস্যবপন ও শস্যচ্ছেদনের অল্প কয়েকদিন ব্যতীত তাহার সারা বৎসর কাটিত দিবা-নিদ্রার তন্দ্রাচ্ছন্ন সুপরিতৃপ্ত নিশ্চেষ্ট আরামে। কাজেই বাঙ্গালীর কথাসাহিত্য কর্মজীবনের সঙ্গে সংগত স্বাভাবিক সাহিত্য হইয়া উঠে নাই, হইয়াছে অস্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রী জীবনের সহচর একটা ক্লান্তিকর অস্বাভাবিক সাহিত্য। প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি শ্রোতৃ-চিত্তের উপযোগী শ্লথ-বিন্যস্ত, লঘুসত্ত্ব ও স্ফীতকায়; কবিগণ মূল-আখ্যানের মধ্যে বহু অবান্তর কথা, উপাখ্যান এবং উপ-উপাখ্যান সন্নিবেশিত করিয়া কাব্যকে যথেচ্ছ প্রলম্বিত করিয়াছেন, তথাপি শ্রোতৃবর্গের ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই। সময়ের মূল্যবোধ থাকিলে গায়কের পক্ষে একাধিক্রমে আটদিন, বারোদিন, এমনকি একমাস ধরিয়া একই মঙ্গলকাব্যকে ইনাইয়া-বিনাইয়া গান করা সম্ভবপর হইত না। সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য হইতেই বাঙ্গালীর মনে এই জড়তার অবসান ও সময়-চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। নবযুগে জাত বলিয়াই মৈমনসিংহ-গীতিকার পালাগানগুলি অনতিদীর্ঘ, সুসংহত, সারগর্ভ ও যথাকালে সম্পূর্ণ। এক-একটি গাথা দিনের হিসেবে নহে, ঘণ্টার হিসাবেই পাঠ্য। প্রাচীন আখ্যায়িকা-কাব্যের ন্যায় ইহা পাঠকের অযথা সময় নষ্ট করে না। এইখানে রহিয়াছে মৈমনসিংহ-গীতিকার আধুনিকতা।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মৈমনসিংহ-গীতিকার গাথাগুলির রচনা-কাল সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত থিয়োরি প্রচার করিয়া গিয়াছেন; ইহাতে পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, কেনারাম, রূপবতী, কঙ্ক-লীলা এবং দেওয়ানা মদিনা এই নয়টি গাথা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেওয়ান ভাবনা ও দেওয়ানা মদিনা, মুসলমানী পালা এবং মলুয়া, চন্দ্রাবতী ও কঙ্ক-লীলায় মুসলমান-সম্পর্কের ব্যাপার আছে। এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হইয়া দীনেশচন্দ্র মৈমনসিংহ গীতিকা-গ্রন্থের ভূমিকায় গাথাগুলিকে একেবারে মুসলমান-পূর্ব যুগের (১০ম-১২শ শতকের) রচনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।[১] পরে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পঞ্চম সংস্করণে তিনি এই প্রত্যক্ষ ভুল সংশোধন করিয়া ইহাদিগকে মুসলমানযুগের সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু "চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত"[২] বলিয়া পুনর্বার সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। গাথাগুলির ঘটনায়, ভাষায় ও অলংকারে সর্বত্র বৈষ্ণব প্রভাব থাকা সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র সত্যকে দাবাইয়া রাখিয়া গাথাগুলির প্রাক্-চৈতন্যত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন— "পল্লী গীতি-কবিতায় বৈষ্ণব প্রভাব আদৌ নাই।"[৩] চৈতন্য-পূর্ব যুগে 'মহুয়া'র নায়কের 'নদের চাঁদ' নাম কি করিয়া সম্ভব হইল, মহুয়ার পালঙ্ক-সখী 'চান্দের সমান' গৌরবর্ণ নায়ককে কেন 'কালা' ('দুইজনে সাজাইব ঐ না নাগর কালা') বলিয়া অভিহিত করিল, 'দেওয়ান ভাবনা'য় নায়িকা 'সোনাই' তাহার প্রণয়ী মাধবকে কেন 'বনমালী' ('কোন্ কুঞ্জে বিরাজ করে আমার বনমালী') বলিল, 'কঙ্ক-লীলা'য় কঙ্কের কি করিয়া গৌরাঙ্গ-পূর্ব যুগে গৌরাঙ্গ-ভক্তি জন্মিল ('গৌরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত হয় সেই জন')—এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্বাক। মৈমনসিংহ-গীতিকা মনোযোগ সহকারে পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায়—একমাত্র কেনারামের পালাই অল্প একটু প্রাচীন হইতে পারে, অন্য সমস্ত পালাই অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বা ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের রচনা। 'কমলা'-পালাটিতে কেবল যে ভারতচন্দ্রীয় রূপ বর্ণনা[৪] আছে তাহা নহে, 'চিকন গোয়ালিনী' চরিত্রে ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর সুস্পষ্ট অনুকরণ দেখা যায়।[৫] এইখানে প্রমাণ—এই গাথা ভারতচন্দ্র-পরবর্তী। ইতিহাসের দিক দিয়া মৈমনসিংহ-গীতিকা আধুনিক বলিয়াই ইহার অন্তর্গত আধুনিক মনোবৃত্তিকে অকালজ ও অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা চলে না।

পণ্ডিতমহলে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে, মৈমনসিংহ-গীতিকা অশিক্ষিত এমনকি "নিরক্ষর"[৬] কবিগণের মৌখিক রচনা। গাথাগুলি নাকি ঘুণাক্ষরের ন্যায় স্বভাবজ। "যাহারা রচনা করিয়াছে তাহারা সাহিত্য বলিয়া অপূর্ব কিছু সৃষ্টি করিতেছে তাহাও কোনোদিন ভাবে নাই।...ঘুণ আপন প্রয়োজনে কাঠ ফুটা করিয়া যায়, তাহাতে অনেক সময়ে অক্ষরের সৃষ্টি হয়। ...আমরা সেই ঘুণাক্ষরের ন্যায় আজ ঐগুলিকে সাহিত্য বলিয়া চিনিতে পারিতেছি।"[৭] ঘুণ হয়ত অক্ষর সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু কথা সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কাব্য মানস-সৃষ্টি, প্রকৃতির মধ্যে মন নাই, সেইজন্য কাব্য স্বভাবজ হইতে পারে না। 'মিরাক্‌ল' বা দৈবলীলা বর্তমান যুগে অবিশ্বাস্য। গীতিকার কবিগণ শুধু যে সুশিক্ষিত ছিলেন তাহাই নহে; মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রামায়ণ, বৈষ্ণব পদাবলী এমন কি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যও ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন, গাথাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তবে পূর্বজ সাহিত্যের

প্রভাব গাথাগুলির অন্তর্লীন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। গাথাগুলির দিগ্‌বন্দনা ও বারমাস্যা বর্ণনা মঙ্গলকাব্যেরই প্রভাব জাত। কেনারামের পালা রামায়ণের রত্নাকর-দস্যুরই নূতন কাহিনি। 'ভাবনা'র সোনাই হরণ মুসলমান রাবণের সীতাহরণ মাত্র। 'কমলা'-পালার চিকন গোয়ালিনী যে বিদ্যাসুন্দরের হীরা মালিনী তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীও গাথাগুলির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবনের যমুনাকূলের পরিবর্তে গ্রামের পুকুরঘাটে জল আনিতে গিয়াই গীতিকার নায়িকারা প্রেমে পড়িয়াছে। মহুয়ার নায়ক নদেরচাঁদ তাহার প্রণয়িনীকে বাঁশীর সুরেই অভিসারে ডাকিয়াছে। কঙ্ক-লীলায় নায়ক কঙ্ক শুধু যে কৃষ্ণের মতোই গোচারণ করিয়াছে তাহা নহে, তাহার বাঁশীর সুরে ধেনুও ছুটিয়াছে[৮] নদীও উজান বহিয়াছে।[৯] বৈষ্ণবীয় অলংকার প্রয়োগের তো কথাই নাই। "অঙ্গের লাবণি সুনাই-এর বাইয়া পড়ে ভূমে"—প্রভৃতি অলংকারগত বৈষ্ণব প্রভাবের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত স্বয়ং দীনেশচন্দ্রই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র (৫ম সং) ৫৭২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। শুধু পূর্বজ কাব্য-স্বীকরণ শক্তি নহে, গীতিকা-কবিগণ যে আধুনিকোচিত মনস্তত্ত্ব-পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। বিপৎকালে মহুয়ার স্বভাব-গোপন ও দ্বৈত সত্তার প্রকাশ, বিরহিণী লীলার আশা-নৈরাশ্যের দোলাচল-চিত্ততা, তালাক-নামাকে অস্বীকার করিয়া মদিনার স্বামী-প্রেমের দিবা-স্বপ্ন, গর্গের চিত্তে কঙ্কের প্রতি স্নেহ ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব-জাত উন্মত্ততা, সোনাই-এর বিষপানের পূর্বমুহূর্তে তাহার শৈশবকালে মৃত ও বিস্মৃত পিতার জন্য দুঃখ,[১০] মলুয়ার নৈরাশ্যময় ভয়ংকর জীবন-বৈরাগ্য কবিগণের মানসিক প্রাচীনতা, অপরিণতি বা অশিক্ষিত-পটুত্বের পরিচয় দেয় না। জীবনের জটিল অসাধারণ অবস্থায় উৎপন্ন বিচিত্র মানসিক অবস্থার রূপায়ণ কখনই কোন নিরক্ষর কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রকৃত কথা হইতেছে—গীতিকার কবিগণ সকলেই ছিলেন পল্লীবাসী এবং দরিদ্র, রাজা-বাদশা বা জমিদারকে শ্রোতারূপে পাইবার কোন আশা করেন নাই, অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীর জন্যই গাথা রচনা করিয়াছিলেন ; নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের সহিত একাত্ম হইয়া সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় ও ভঙ্গিতে রচনা করিয়াছিলেন গীতিকা। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা নিজেরা অশিক্ষিত ছিলেন না। গ্রাম্য ভাষায় সেইজন্য তাঁহাদের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য ঢাকা পড়িয়া যায় নাই, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় উহা মধ্যে মধ্যে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। অশিক্ষিত কবিত্ব ছেলে-ভুলানো ছড়াই সৃষ্টি করিতে পারে, পণ্ডিত-ভুলানো মনস্তাত্ত্বিক ব্যালাড রচনা করিতে পারে না।

মৈমনসিংহ-গীতিকার কবিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন ঔপন্যাসিকের মতো জীবন-রসের রসিক। কেহই জীবনকে সহজ সরল রূপে দেখেন নাই, বিচিত্র পরিস্থিতিতে প্রেমের নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির পরিকল্পনায় জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়া তবেই উপভোগ করিয়াছেন। অবশ্য গীতিকার নায়িকারা সকলেই মূলে প্রায় একপ্রকার—সকলেই কিশোরী, কুমারী অবস্থায় অনুরাগিণী, প্রেমে নিষ্ঠাবতী এবং প্রায় সকলেরই জীবন দুঃখময়। কিন্তু নায়ক-চরিত্রের ভিন্নতা এবং পরিস্থিতির বৈচিত্র্য

গাথাগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে—একটি অপরটির অনুকৃতি হয় নাই। কবিগণের কবিত্ব-শক্তিরও সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সেইজন্য মহুয়া হইয়াছে চলচ্চিত্রের সিনেরিও বা চিত্র-নাট্য, মলুয়া হইয়াছে কাব্য, চন্দ্রাবতী ও দেওয়ান ভাবনা ছোটগল্প, কাজলরেখা শিশুমনের এবং রূপবতী ও কমলা বয়স্কদিগের রূপকথা, কঙ্ক ও লীলা ছোট উপন্যাস, দেওয়ানা মদিনা জীবন-চিত্র এবং কেনারাম পৌরাণিক উপাখ্যান। ইহাদের কোনোটিই পঙ্গু ও দুর্বল নহে; তথাপি যেহেতু বর্তমান যুগ বায়োস্কোপের যুগ, সেহেতু মহুয়ারই হইয়াছে সর্বাধিক খ্যাতি।[১১] কিন্তু নিরপেক্ষ রসবিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকা চন্দ্রাবতী। ইহা কেবল বাংলার নহে, বিশ্বসাহিত্যেরও একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প—গাঢ়-সংবদ্ধ, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতপূর্ণ, আদ্যন্ত রিয়ালিস্টিক এবং যথার্থভাবে ট্রাজিক। ইহাতে ভাবোচ্ছ্বাসের সর্ববিধ চপলতা নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কবি আর্টের কঠোর শাসনে মর্মভেদী হাহাকারকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে নায়িকা দেখা দিয়াছে অন্তর্গূঢ় মর্মান্তিক বেদনার মূর্তিমতী প্রতিমা রূপে। মৈমনসিংহ-গীতিকায় নায়িকার আত্মত্যাগ-চিত্রের অভাব নাই; মহুয়া, মলুয়া, সোনাই, লীলা ও মদিনা সকলেই প্রেমের জন্য আত্মবলি দিয়াছে, কিন্তু ইহাদের কেহই সত্যকার ট্রাজিক হয় নাই। ইহাদের মৃত্যু করুণ ও মর্মান্তিক সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রেমের গৌরবে, পরার্থপরতার মহিমায়, মৃত্যু-বরণের বীর্যে এই মৃত্যু মহনীয়—অস্থিদানকারী পৌরাণিক দধীচির দেহত্যাগের তুল্য ইহা জ্যোতির্ময়। কিন্তু এই সকল নায়িকার ন্যায় মরিয়া জ্বালা জুড়াইবার সৌভাগ্য চন্দ্রাবতীর হয় নাই; সারাজীবনব্যাপী সুদীর্ঘ দিন ও দীর্ঘতর রাত্রির চির-জাগ্রতা অন্তর্জ্বালাময়ী এই চন্দ্রাবতী। গীতিকার অন্যান্য নায়িকাদেরও দুঃখ আছে, কিন্তু তাহাদের দুঃখ বহিরাগত, চন্দ্রাবতীর মতো অন্তর্জাত ও অন্তর্গূঢ় নহে; ইহাদের সংসার-জীবন ব্যর্থ হইলেও প্রেম ব্যর্থ নহে। কিন্তু চন্দ্রাবতী সর্বতোভাবে রিক্ত—সংসারে তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। তাহার প্রেম অঙ্কুরে পদদলিত। বাহিরের কোন পরব্যক্তির নিকট হইতে নহে, আবাল্য-সঙ্গী নিজের প্রণয়ী জয়ানন্দেরই নিকট হইতে তাহার আসিয়াছে প্রেমজীবনের ব্যর্থতা। বিবাহের রাত্রে বধূবেশিনী চন্দ্রার মাথায় পড়িয়াছে বিনামেঘে বজ্রাঘাত—খবর আসিয়াছে, কাহাকেও না জানাইয়া জয়ানন্দ হঠাৎ এক মুসলমান সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছে। ফলে চন্দ্রাবতী—

সুধাইলে না কয় কথা মুখে নাহি হাসি।
একরাত্রে ফুটা ফুল ঝুইরা হইল বাসি॥

তাহার পর চন্দ্রাবতীকে দেখা যায় চির-কুমারী-ব্রতা যৌবনে যোগিনীরূপে—কঠোর সাধনায় নিজেকে দেব-চরণে করিয়াছে নিবেদিত। কিন্তু অদৃষ্টে শান্তি নাই। মোহভঙ্গের পর অনুতাপদগ্ধ প্রণয়ী আবার ছুটিয়া আসিয়াছে চন্দ্রার কাছে—পত্রে ক্ষমা চাহিয়া ব্যাকুলভাবে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখিতে চাহিয়াছে; চন্দ্রাবতী কাঁদিয়াছে, কিন্তু উত্তর দেয় নাই। মন্দির রুদ্ধ, চন্দ্রা দেবতার ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। উন্মত্ত জয়ানন্দ বৃথাই মন্দির-দ্বারে করিয়াছে করাঘাত; শেষে হতাশ হইয়া রক্ত-মালতীর রসে মন্দির-দ্বারে লিখিয়াছে শেষ বিদায় বাণী—

শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৌবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা করো তুমি চন্দ্রাবতী॥

চন্দ্রার সন্ন্যাসও ব্যর্থ। নারী-হৃদয় পাষাণ হইবার নহে। এইখানেই রহিয়াছে ট্রাজেডির বীজ। "জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি"—এই "পানি" তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা দেখাইয়া দেয়—সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ে প্রেম মরিয়াও মরে নাই, হৃদয়ের ভস্মস্তূপ ভেদ করিয়া আবার তাহার রক্তিম দল বিস্তার করিয়াছে। এখানেই কবি নয়ানচাঁদ নাটকীয় ভঙ্গীতে দেখাইয়াছেন পালার শেষ দৃশ্য। নির্জন নদীতীর, চারিদিক নিস্তব্ধ, জোয়ারের জল বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং—"জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ"। চন্দ্রাবতীর উপেক্ষায় নিদারুণ নৈরাশ্যে হতভাগ্য প্রেমিক আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত অবস্থাতেও কিন্তু—

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউ-এর উপরে ভাসে পূন্নমাসীর চান॥

আর সেই মৃত জয়ানন্দের সম্মুখে—নায়ককে উপেক্ষা করার সুতীব্র অনুশোচনায় মর্মভেদী দুঃখে, অসহ্য শোকে পাষাণ মূর্তিতে দণ্ডায়মানা চন্দ্রাবতী। দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—সেই মহাপ্রলয়ান্তিক ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে চন্দ্রা একাকিনী—

আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে 'উমেদা' কামিনী॥

কাব্য জগতে এ দৃশ্যের তুলনা নাই। মৈমনসিংহ-গীতিকার কাহিনিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহাদের উপন্যাসোচিত সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তব ধর্ম। বাস্তব জীবনেরই এখানে আধিপত্য। কাব্যোচিত প্রেম ও প্রকৃতির মহিমা ইহাতে আছে বটে, কিন্তু প্রেম অপেক্ষা প্রেমিকের মাহাত্ম্যই অধিক ; মানবজীবনের পরিবেশ রচনা ছাড়া প্রকৃতিরও এখানে কোন নিজস্ব ক্রিয়া বা মূল্য নাই। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—সাধারণত কাব্যে, বিশেষ করিয়া গীতিকাব্যে—খনিজ স্বর্ণকে মিশ্রিত ধাতু-বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করার মতো জীবনের মিশ্র অবস্থা হইতে প্রেম ও প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া দেখানো হইয়া থাকে। ইহাতে পাঠকের দৃষ্টিতে প্রেম ও প্রকৃতি যতই সুন্দর হইয়া উঠুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্বভাবের কৃত্রিমতাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বিচ্ছিন্ন প্রেম বা প্রকৃতি—বিশ্বামিত্রের ঈশ্বরবিরোধী তপঃসৃষ্টির মতোই সুন্দর অথচ অসংগত দুই-ই। সেইজন্য উহা পাঠকের মনোবিলাসের সামগ্রীই হইয়া উঠে, সমগ্র হৃদয়কে আলোড়িত করিতে পারে না। কিন্তু মৈমনসিংহ-গীতিকার কবিগণের বিশিষ্টতা এইখানে যে, বাস্তব সত্যের তুচ্ছতার মধ্য দিয়াও তাঁহারা কাব্যকে দেখাইতে সঙ্কুচিত হন নাই—জীবনের মধ্যেই প্রেম ও প্রকৃতিকে দেখাইয়াছেন ; সেইজন্যই উহারা কেবল মনকে নহে, হৃদয়কেও স্পর্শ করে।[১২] গীতিকার নায়ক-নায়িকারা পরস্পরের প্রতি যে প্রেমনিবেদন করিয়াছে, তাহা পুষ্পবনের অ-সাংসারিক নিভৃত প্রেম নহে, সংসারের জনাকীর্ণ পথের প্রকাশ্য প্রেম। উহা যথার্থভাবে সাংসারিক—সংযত ও সংগত। অথচ গীতিকায় প্রেমের সব কথাই বলা হইয়াছে—

তুমি আমার মুখের মধু, গলার পুষ্পমালা।
ফুল তুইল্যা দিবাম কন্যা তুমি গাঁইথ্যো মালা॥
বাড়ীর পাছে বান্ধা ঘাট আছে পুষ্করিণী।
তুমি কন্যা জলে যাইতে সঙ্গে যাইবাম আমি॥
ভরিতে না পার কন্যা ভইরা দিবাম কোলে।
তোমারে লইয়া কন্যা সাঁতার দিবাম জলে॥
গলায় গাঁথিয়া দিবাম 'জোনাকীর মালা'।
বাসরে শিখাইবাম কন্যা তোমায় রতি-কলা॥

বলিতে আর বাকি রহিল কী? অথচ এই প্রেম বিদ্যাসুন্দরের প্রেমের ন্যায় কর্মজীবনবিচ্ছিন্ন প্রাত্যহিকতাচ্যুত রুগ্ন বিলাসের বৃন্তহীন পুষ্প হইয়া উঠে নাই। ইহাতে বাড়ি, ঘর, পুষ্করিণী, পিতা, মাতা—সংসারের বৈচিত্র্য, কিছুই বিলুপ্ত হয় নাই। অদৃষ্টের সহিত জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও পরাজিত মলুয়া নিদারুণ নৈরাশ্যে নদীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, কিন্তু কবি মলুয়ার বেদনাকে সংসারচিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখান নাই। মহাপ্রস্থানকালেও মলুয়া শাশুড়ি, ননদ, ভ্রাতা, স্বামী, এমনকি সপত্নীর নিকট হইতেও বিদায় লইতে ভুলে নাই; একে একে সকলকে কাঁদাইয়া তবেই মরণের সায়রে ঝাঁপ দিয়াছে। কবি দেখাইয়াছেন—যেখানে মলুয়ার সহিত চাঁদবিনোদের প্রেম ঘনাইয়া একান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই—"আশ্বিনে পূবের মেঘ পশ্চিমে ভাস্যা যায়।" মেঘের এই ভাসিয়া যাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের শোভাবৃদ্ধির জন্য নহে, সংসার-বিস্মৃত প্রেমোন্মাদ নায়ককে পশ্চিমে প্রতীক্ষমানা জননীকে দেখাইবার জন্যই মেঘের এই 'মেঘদূত'ত্ব। তাই দ্বিতীয় চরণেই বলা হইয়াছে—"ঘরে থাক্যা কান্দ্যা মরে অভাগিনী মায়॥" গীতিকায় জীবনের এই ভারসাম্য অতুলনীয়। বাস্তব সংসারেও ভারসম প্রেমই প্রেমের সত্যকার স্বাভাবিক রূপ।

প্রকৃতির চিত্রও গীতিকায় ভারসম সংসারধর্মের ব্যত্যয় হয় নাই। গীতিকায় প্রকৃতি স্বচ্ছন্দচারিণী বা স্বৈরিণী নহে, সংসারের একটি অঙ্গ মাত্র এবং মানবজীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইহাতে মানুষের সুখে দুঃখে তাহার বিভিন্ন ক্রিয়া আছে, কিন্তু সে কদাচ প্রাণময়ী সহধর্মিণীর মর্যাদা পায় নাই। গীতিকায় প্রকৃতি চেতনাময়ী নহে, তাহার সহানুভূতি নাই, কিন্তু রস-পরিপোষণ আছে, এই রস-পোষণ প্রকৃতির ঠিক ক্রিয়া নহে, প্রতিক্রিয়া মাত্র। মানবজীবনের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মানবজীবনের ক্রিয়ায় প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। মহুয়া ও নদেরচাঁদের মিলনরজনী ছিল জ্যোৎস্নালোকিত, কিন্তু যেমনি আততায়ী হুমরা বেদে ছুরিকাহস্তে যমদূতের মতো আবির্ভূত হইয়াছে, অমনি—

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সোনালী চান্নির রাইত আবে পড়ল ঢাকা॥

ইহা প্রকৃতির সহানুভূতি নহে, নিষ্ঠুর হত্যাদর্শন গগনচারীর পক্ষে অসহনীয় নহে; হুমরার ক্রিয়ার ফলেই এখানে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া। ইহাতে ভয়ানক রসের পুষ্টিসাধন

হইয়াছে। ভয়ংকরতা ফুটাইবার জন্য সোনাই-এর বিষপানের সময়ে "নিশি রাইত মেঘে আন্ধা আসমানে নাই তারা" কিংবা "আসমান কালা, জমীন কালা, কাল্ নিশা যামিনী"। গীতিকায় প্রকৃতির যে সহানুভূতি নাই, তাহার প্রমাণ আছে। যাহার সহানুভূতি আছে, তাহার পক্ষে বিপদে শত্রুতা করা সম্ভব নহে। যে নদী মহুয়া-নদেরচাঁদের সুখের দিনে জল-খেলা করিয়াছে—"সামনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।" সেই নদীই আবার তাহাদের বিপন্ন অবস্থায় পলায়নকালে করিয়াছে চরম শত্রুতা—"বিস্তার পাহাড়িয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি।" প্রকৃত কথা, গীতিকা-কবি প্রকৃতিকে অকারণ প্রাধান্য দিয়া তাহার চেতনা বা সহানুভূতি প্রমাণ করেন নাই—রসসৃষ্টির প্রয়োজনে জড়বস্তু রূপেই তাহাকে ব্যবহার করিয়াছেন। জীবনের সহিত ভারসাম্যহীনা ও অতিবর্ধিতা রোমান্টিক প্রকৃতিকে মৈমনসিংহ- গীতিকায় দেখা যায় না।

গীতিকার রচয়িতারা জীবন-নিষ্ঠ ও বাস্তবতা-প্রিয় হইলেও অরসিক বস্তুবাদী নহেন, রসিক জীবন-শিল্পী বা কবি। জীবনকে তাঁহারা করিয়াছেন পূর্ণমাত্রায় উপভোগ। তাঁহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম, মন জাগ্রত। মানবচরিত্রের নিগূঢ় ইঙ্গিত, প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন হাবভাব ও কটাক্ষ, প্রকৃতির মৃদুতম লীলা-বিলাস তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। সেইজন্য মৈমনসিংহ-গীতিকা হইয়াছে বিচিত্র সৌন্দর্যের চিত্রশালা। নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য—

১. আষ্ট দাঁড়ে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
'পঙ্খী-উড়া' করে পানসী ভাইঙ্গা পদ্মবনে॥
'উড়া' শব্দে পানসীর দ্রুততা এবং 'পঙ্খী' শব্দে লঘুতা ও তৎসহ কবির আনন্দ ব্যঞ্জিত।

২. শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তোরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন পুরুষেরে॥
ইহা মলুয়ার নিজের উক্তি নহে, কবিই এইভাবে তাহার মনের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করিতেছেন। নায়িকার লজ্জা ও প্রেম দ্রষ্টব্য

৩. ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকবাম এক দিবা রাতি॥
উপমার স্বাভাবিকত্ব ও চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়।

৪. ভিনদেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥
'পূর্বরাগ' বিভাব সৃষ্টির দক্ষতা প্রকাশিত।

৫. যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি বাঁশে মাইল লাড়া।
বইস্যা ছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা হইল খাড়া॥
কৌতূহল-চিত্রের নৈপুণ্য দ্রষ্টব্য।

৬. আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি ফোটা ফুল কাল দেখ্যাছি কলি॥
ননদীর পূর্বরাগ লক্ষণে ভ্রাতৃ-জায়ার রসিকতা দ্রষ্টব্য।

৭. উঠ উঠ নাগর—কন্যা ডাকে মনে মনে।
কি জানি মনের ডাক—সেও নাগর শুনে॥

সরলা প্রেমিকার নির্বোধ আশার প্রতি কবির স্নিগ্ধ কৌতুক-হাস্য দ্রষ্টব্য।

৮. বৈদেশেতে যায় যাদু যদ্দূর দেখা যায়।
পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায়॥
বাঁশের ঝাড় বন জঙ্গল পুতের পৃষ্ঠে পড়ে।
আঁখির পানি মুছ্যা মায় ফির্যা আইল ঘরে॥

মাতৃ-হৃদয়ের চিত্রাঙ্কনে কবির মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ-দক্ষতা প্রকাশিত।

৯. কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে॥

কবির সংক্ষেপে প্রকৃতি-বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

মৈমনসিংহ-গীতিকা পল্লীভাষার পঙ্কে জাত পদ্মফুল। বঙ্গদেশের পূর্বতম প্রান্তে লোকলোচনের অন্তরালে ইহার জন্ম বটে, কিন্তু সৌরভ বিস্তারে সমস্ত পৃথিবীকে আমোদিত করিয়াছে। ইহাতে বঙ্গের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যের ইহা চিরন্তন সম্পদ। একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার সমকক্ষ আখ্যানধর্মী প্রেমের কাব্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিধুবাবুর টপ্পা ভাবের গান মাত্র, কথা-সাহিত্য নহে। বঙ্গদেশে ইংরেজ আগমন না ঘটিলেও স্বাভাবিকভাবেই যে বঙ্গাসাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের জন্ম হইতে পারিত, মৈমনসিংহ-গীতিকাই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

উৎসের সন্ধানে

১. মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ১৩

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৫১৭

৩. তদেব

৪. নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে।
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে॥—কমলা

৫. সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী।
দই দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী॥
যখন আছিল তার নবীন বয়স।
নাগর ধরিয়া কত করত রঙ্গরস॥
যদিও যৌবন গেছে তবু আছে বেশ।...
তুলনীয়— কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম...
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

৬. মৈমনসিংহ-গীতিকা, ভূমিকা, পৃ. ১৮

৭. 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', দ্বিতীয়াংশ, পৃ. ৩২০

৮. বাথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন বেণু।
উচ্চ পুচ্ছে ছুটে আসে গোষ্ঠের যত ধেনু॥

৯. কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজার বাঁকে॥

১০. শিশুকালে বাপ মইল—এতেক নাই মনে।
সেইত দুঃখের কথা আইজ পড়িল মনে॥

১১. ভারতের ভূতপূর্ব লাট লর্ড রোনাল্ডসে, স্টেলা ক্র্যামরিস, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'মহুয়া' পালারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

১২. কেবল প্রেম বা প্রকৃতি নহে, জীবনের সর্ববিধ অবস্থাই গীতিকাতে তুচ্ছ বাস্তবের সহিত ওতপ্রোত। বর্ণনীয় কাহিনির ধারাবাহিকতার আকস্মিক ফাঁকগুলি ভরাট করিতে আবর্জনার ন্যায় তুচ্ছবস্তুই ব্যবহৃত হইয়াছে—

ভাত রাইন্দো মা জননী না ফালাইও ফেনা।
তোমার পুত্র বৈদেশ যাইতে না করিও মানা॥

এই 'ভাতের ফেনা'র মতো তুচ্ছ আবর্জনাও কিন্তু কাহিনিকে জীবন্ত ও বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে।

অর্থ নির্দেশ

- উমেদা = উন্মাদিনী
- আসমান = আকাশ
- আব = মেঘ
- ছেরি = কন্যা

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা

তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

পূর্ববঙ্গের গীতিকথাগুলি বঙ্গসাহিত্যের অপূর্ব সামগ্রী। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন এই গীতিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গীতিকাসমূহের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষতা ড. সেন যেরূপ আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিকতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলি পাঠ করিলে নানারূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এই সকল প্রশ্ন নিয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।[১] মৈমনসিংহ-গীতিকা (প্রথম খণ্ড) ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড) নামক সংগ্রহদ্বয়ের ভূমিকাতে নানারূপ গবেষণামূলক আলোচনা আছে। বর্তমান সমালোচনায় ভূমিকা দুইটি আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবে।

এই গীতিকাগুলি কত প্রাচীন তাহা নিয়া মতভেদ আছে। ভাব, ভাষা বা বিষয়বস্তু ইহার কোনোটিকেই অবলম্বন করিয়া একটি পালাগানের প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা দুরূহ। পল্লীগীতির অনাড়ম্বর ভাব ও সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। নগরে, রাজদরবারের আবেষ্টনীর ভিতরে যেরূপ কবিতা রচিত হইবে, গ্রামে পল্লীজননীর ক্রোড়ে বসিয়া অর্ধশিক্ষিত কবি তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ কবিতা রচনা করিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। ভাষার দিক দিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, নগরে বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া ও কৃত্রিম সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লোকে যেরূপ ভাষা ব্যবহার করে গ্রামের লোকের ভাষা সেইরূপ হয় না। গ্রামে ভাব বা ভাষার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম হয়। বহু প্রাচীনকালের ভাষার অনেক নিদর্শন এখনও পল্লীগ্রামেই পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ নহে। এই শ্যামা বঙ্গভূমির এক এক অংশে এক এক রূপ কথ্যভাষা প্রচলিত আছে। ইহা পরস্পর হইতে এত স্বতন্ত্র যে চট্টগ্রামের ভাষা রঙ্গপুরবাসীর পক্ষে বোঝা সহজ নহে, আবার বাঁকুড়ার ভাষা ঢাকাবাসীর পক্ষে ভালরূপে বোঝা কঠিন ব্যাপার। সব দেশ সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। সুতরাং কোনো একটি প্রাদেশিক বা স্থানীয় দুরূহ শব্দ কোনো ছড়ায় পাওয়া গেলেই তাহার দুর্বোধ্যতা হেতু তাহাকে সুপ্রাচীন বলিবার কোনো হেতু নাই। এমতাবস্থায় ভাব, ভাষা, বিষয়-বস্তু, প্রকাশ-ভঙ্গি প্রভৃতি সম্যক

আলোচনা করিয়া সূক্ষ্মবিচারের কষ্টিপাথরে ছড়াগুলিকে ফেলিতে হইবে এবং কোন্ ছড়া কত আধুনিক তাহা এই উপায়ে নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহা যে কত কঠিন কাজ তাহা বিশেষজ্ঞগণ ভালোরূপেই জানেন। সমালোচক এরূপ ক্ষেত্রে ভাবুক যত কম হইবেন ততই মঙ্গল।

প্রাচীন ছড়াগুলি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুসলমান-বিজয় এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী দুই তিন শতাব্দীকাল মধ্যে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ একটি মত আছে। এই মতানুসারে পূর্বমৈমনসিংহের উপর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাবকাল অন্তত সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত (রাজা শশাঙ্কের কাল) এবং এতদ্দেশীয় তান্ত্রিকতাবিহীন হিন্দুধর্মের প্রভাব দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। তাহাই যদি হইল তবে অন্তর্বর্তীকাল ২/৩ শতাব্দী হয় কীরূপে? উহা তো পাঁচশত বৎসর হইয়া পড়ে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রভাব ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব তো এই সময়ের মধ্যেই ধরা হইয়াছে। তবে মুসলমানদিগের আগমনের ২/৩ শত বৎসর পূর্বেই কামরূপের রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান হইয়াছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর তিনশত বৎসর পরেও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্য হিসেবে কতকটা ক্ষমতাশালী ছিল ইহা অনুমান করিয়া না লইলে এই মতের কোনো সামঞ্জস্য হয় না। ইতিহাসে দেখা যায় খ্রি. ৮ম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত পালরাজগণ ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে প্রবল এবং ১১শ কি ১২শ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সেনরাজগণ বাঙ্গালাদেশে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। সুতরাং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাবকাল সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ধরিলে তখন পাল ও সেন রাজবংশের জন্ম হয় নাই। এই প্রভাবকালের শেষ বিখ্যাত রাজা শশাঙ্ক শুধু প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপের রাজা ছিলেন না। তাঁহাকে আমরা বাঙ্গলার কিয়দংশের রাজা বলিয়াও জানি। কিন্তু ৮ম ও ৯ম শতাব্দী হইতে যখন তান্ত্রিকতার পূর্ববর্তী হিন্দুধর্ম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বিরাজমান তখন উত্তরবঙ্গে পালরাজগণ প্রবল। তবেই দেখা যাইতেছে ৮ম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত পালরাজগণ ও ১১শ শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত সেনরাজগণ বাঙ্গালায় প্রভুত্ব করিতেছেন। তাহার পরই মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কী এরূপ মনে হয় না যে, কামরূপের পর ক্রমান্বয়ে পাল, সেন ও মুসলমান রাজগণ বাঙ্গালাদেশে তথা মৈমনসিংহের পূর্বাঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন? ড. সেনের বোধ হয় মত যে, পাল ও সেনরাজগণের সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপ-রাজগণ তাঁহাদের অবনতির সময়েও নামেমাত্র পূর্ব-ময়মনসিংহের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। পালরাজাদের কথা ছাড়িয়া দিই, সেনরাজগণও এই অঞ্চলে কখনও ভালোরূপে প্রভুত্ব করিতে পারেন নাই, যেহেতু সেনবংশ পশ্চিম ময়মনসিংহ অধিকার করিলেও নদীমাতৃক ও অরণ্যবহুল "পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ব করিতে পারেন নাই" তাহার ফলে পূর্বময়মনসিংহের ক্ষুদ্র রাজগণ সেনরাজগণ প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও কৌলিন্য স্বীকার করেন নাই এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও তদ্দেশ প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্মের আদর্শ বিস্মৃত হন নাই। আমরা যেন একটা কথা ভুলিয়া না যাই। মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায়

দেখিতে পাই যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পূর্বময়মনসিংহ নামক ক্ষুদ্র ভূখণ্ড সেনরাজগণকে তত আমল না দিয়া কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই সব রাজত্বের বর্ণনায় যে রাজ্যের নাম সর্বাগ্রে পাই, উহা সুসঙ্গ-দুর্গাপুর। এই রাজ্যের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাল ১২৮০ খ্রিস্টাব্দ। ইহাই দেখিতেছি সর্বপ্রথম স্থাপিত খণ্ডরাজ্য। এই সময় বাঙ্গালায় পাঠান শাসনকাল, কারণ মুসলমানগণ রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালায় প্রথম রাজত্ব স্থাপন করে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে।[২] পশ্চিমবঙ্গে সেন রাজবংশ ধ্বংসের প্রায় একশত বৎসর পরে যদি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে পূর্ব-মৈমনসিংহ মুক্ত হয় তবে এই অঞ্চলে সেন রাজবংশের প্রভাবের কথা উঠিতেই পারে না। নবদ্বীপ মুসলমানদিগের অধিকারে আসিলে পূর্ববঙ্গের রামপাল রাজধানী হইতে সেনরাজগণ আরও প্রায় শতবর্ষ সে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কথা ড. সেন মনে করিয়া থাকিলে আর কোনো গোল বাধে না। কিন্তু তিনি মুসলমান আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ২/৩ শতাব্দী কাল অর্থাৎ ১০ম, ১১শ কি ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত কামরূপ-প্রভাবমুক্ত পূর্ব-মৈমনসিংহের অবস্থার কথা কল্পনা করিয়াছেন। তিনি খণ্ডরাজ্যগুলির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সময় ধরিয়াছেন ১২শ কি ১৩শ শতাব্দী।

সেন রাজবংশে পূর্ব-মৈমনসিংহ ভালোরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা ইহা নিয়ে মতভেদ আছে। মৈমনসিংহর পূর্বাঞ্চল একটি বৃহৎ দেশ নহে। ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন খাত এই মৈমনসিংহ জেলাকে কোণাকোণিভাবে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সেন রাজবংশ পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক ঢাকা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলেন আর এই পূর্ব-মৈমনসিংহে অধিকার স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিশাল পদ্মা নদী অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরের রামপালে একটি রাজধানী পর্যন্ত স্থাপন করিলেন আর ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতে অপারগ হইলেন, ইহা কিরূপ কথা? সমগ্র বঙ্গদেশ সেনরাজগণ প্রবর্তিত যে সামাজিক বিধি গ্রহণ করিল, পূর্ব-মৈমনসিংহ তাহা গ্রহণ করিল না। সেই প্রদেশ কামরূপের অধিকারমুক্ত হইয়াও হিন্দুধর্মের তদ্দেশ প্রচলিত প্রাচীন আদর্শ আঁকড়াইয়া রহিল, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। পাল রাজাদের সমসাময়িক রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহ অতিক্রম করিয়া কুমিল্লা (ত্রিপুরা) পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। আবার সেন রাজারা পদ্মানদী অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিতে ভয় পাইতেন, আর কামরূপ-রাজগণ গারো পাহাড় অতিক্রম করিয়া মৈমনসিংহের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব বিস্তার করিলেনই, আরও তাহাদের রাজত্বের অবসানে প্রাচীন হিন্দুধর্মটুকু পূর্ব-মৈমনসিংহবাসীদিগকে দিয়া গেলেন। এইরূপ যুক্তি আমরা সমর্থন করিতে অপারগ[৩]।

মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায় আছে "এই সকল গীতিকার নায়ক নায়িকাদের কাহারও বাল্যকালে পরিণয় হয় নাই। চৌদ্দ, পনের এমন কি সতের বৎসর পর্যন্ত মেয়েদিগকে অবিবাহিতা দেখিতে পাই।" ভূমিকার অপর স্থলে যাহা আছে তাহা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—"এই হিন্দুধর্মে (কামরূপের প্রাচীন

হিন্দুধর্মে) বল্লালসেন- প্রবর্তিত 'গৌরীদান', আচার-বিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। পূর্ব-ময়মনসিংহ রঘুনন্দনকে গ্রহণ করে নাই।" এই উপলক্ষ্যে জাতিভেদ যে প্রবল ছিল না তাহাও "কঙ্ক ও লীলা" উপাখ্যান হইতে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে! বোধ হয় ভূমিকাতে লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কামরূপের প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রভাব এখানে কিরূপ প্রবলভাবে বর্তমান ছিল। অথচ আমরা ড. সেনের আবিষ্কৃত গীতিকাগুলির মধ্যেই অবাধ প্রেমের বর্ণনা অপেক্ষা রঘুনন্দনী বাল্য-বিবাহের বিবরণই অধিক পাইতেছি। এই বাল্য-বিবাহ রঘুনন্দনের অভ্যুদয়ের কয়েক শতাব্দী পূর্বে রাজা গোপীচাঁদেরও হইয়াছিল। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে (১১-১২শ শতাব্দী)[৪] এবং অন্যান্য স্থলে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। গীতিকাগুলির মধ্য হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বাল্য-বিবাহের নমুনা দেখাইব—

১. বার না বছরের কন্যা পরমাসুন্দরী।
না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মন ভারি॥
—মলুয়া (মৈমনসিংহ-গীতিকা)

২. এক দুই করি দেখ তের বছর যায়।
আমার বিয়ার কথা কয় বাপ মায়॥
—কমলা (মৈমনসিংহ-গীতিকা)

৩. দশ বছর গিয়া সুনাইগো এগারতে পড়ে।
কন্যার যৈবন দেখ্যা গো ভাব্যা চিন্তা মরে॥
এতেক সুন্দর কন্যা গো তাহাতে যুবতী।
কেবা বিয়া দিব কন্যার গো কেবা করে গতি॥
—দেওয়ান ভাবনা (মৈমনসিংহ-গীতিকা)

৪. বার না বছরের কন্যা তেরোতে পড়িল।
আপনে দেখিয়া আপনে চিন্তিত হইল॥
—কঙ্ক ও লীলা (মৈমনসিংহ-গীতিকা)

৫. এগার বছরের কন্যা বারয় নাইসে পড়ে।
বিয়ার কাল হইল কন্যার চিন্তে সদাগরে॥
—কাজলরেখা (মৈমনসিংহ-গীতিকা)

এই লীলার প্রেমাস্পদ কঙ্ক, লীলা হইতে অল্প বড় ছিল।

৬. দেবাংশী হইল কন্যা নয় না বছরে।
যৈবনের লক্ষণ দেখা দিল না শরীরে॥
—কাঞ্চনমালা (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা)

৭. বার না বছরের হারে শান্তি তের নাহি পোরে।
আজ যৈবনের ভারেতে শান্তি তুমি জামাই বল কারে॥
—শান্তি (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা)

মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার বর্ণনা গীতিকাগুলি হইতে উদ্ধৃত করার আর বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। অনধিক ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যাগণের যৌবনোদ্গম ও প্রেমকাহিনির সুদীর্ঘ বর্ণনা গ্রাম্য কবিগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এই গীতিকাগুলিতে ৮ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকাদের বিবাহের কথা এত প্রচুর রহিয়াছে যে রঘুনন্দনকে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না। "মহুয়া", ধোপার পাট" এবং "মৈষাল বন্ধু"র ন্যায় কতিপয় গীতিকায় যুবক-যুবতীর অবাধ প্রেমকাহিনি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ গল্পের সংখ্যা বেশি নহে। অল্পবয়সে বা যৌবনাবস্থায় যেখানেই অবাধ প্রেমকাহিনির বর্ণনা আছে, সেইখানেই স্পষ্ট দেখানো হইয়াছে যে, ইহা সমাজের রীতিবিরুদ্ধ। ইহা গ্রাম বা সমাজের "দশজনে" পছন্দ করে না। তাহাতে অন্তত প্রেমিকার অপূর্ব স্বার্থত্যাগের ও আত্মোৎসর্গের বর্ণনা আছে বটে এবং তাহাতে প্রেমকে যথেষ্ট উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজবন্ধনটিকেও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হইয়াছে। সমাজের সাধারণ বিধির বিরুদ্ধে যাইয়াই ত প্রেমিকযুগলের কঠোর প্রেম-সাধনার পরীক্ষা হইয়াছে। সুতরাং বল্লালী, বিশেষত রঘুনন্দনী, সমাজবন্ধন স্বীকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। তাহা প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে গীতিকথার যে তারতম্য করা হইয়াছে তাহার কথা। প্রেমিকা প্রেমাস্পদের জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত চিত্তে যেরূপ কষ্ট ও কলঙ্ক সহ্য করিয়াছে, নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া প্রেমের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে, তাহা যে কোনো যুগ ও যে কোনো দেশে নারীজাতির গৌরবের বস্তু। এই গীতিকাগুলির অধিকাংশ নারী-চরিত্র সীতা-সাবিত্রী কি বেহুলা-ফুল্লরার সহিত একসঙ্গে উচ্চারিত হইবার উপযুক্ত। এই মহীয়সী নারী-চরিত্রকে ড. সেন যেরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু গীতিকাগুলির পুরুষ-চরিত্র কীরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে? উহা নারী-চরিত্রের পাশে অত্যন্ত ম্লান ও হীন হইয়া পড়ে নাই কি? নারী তাহার মর্যাদা রাখিয়াছে কিন্তু পুরুষ তাহার গৌরব রাখে নাই। প্রায়শই গল্পে দেখা যায় তরুণ বয়সে কোনো পুরুষ কোনো সুন্দরী তরুণীর প্রেমে পড়িয়া উন্মত্তপ্রায় হইল এবং হয়তো সমাজের কলঙ্ক মাথায় লইয়া (যাহা নারীর পক্ষেই বেশি) দেশত্যাগী হইল। তারপর কিছুদিন গত হইলে, মোহ কিছু কাটিলে, সেই ব্যক্তি অন্য একটি রূপসীর (বিশেষত তাহার যদি অর্থবল থাকে) প্রেম লাভের সুবিধা হইলে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক প্রথমা তরুণীটিকে কলঙ্ক ও বিপদের অকূল সমুদ্রে নিতান্ত নির্মমের মতো নিক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে দ্বিতীয়া রমণীকে গোপনে বিবাহ করিল এবং সংসারধর্ম করিতে লাগিল। ইহাই ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকাসমূহের অধিকাংশ গল্পের সারবস্তু। অপর পক্ষে বিপদের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া নারী-চরিত্র যেন আপন মহিমায় ও উজ্জ্বলতায় আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলে এবং নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের অন্তরাত্মা ভরিয়া উঠে। এই গীতিকাসমূহের নারীগণ ধ্রুবতারার ন্যায় স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রতি সকল অবস্থাতেই

স্থিরচিত্ত থাকিয়া যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে সমাজের কলঙ্ক ও কৃতঘ্ন প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান অগ্রাহ্য করিয়া অবশেষে স্বীয় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছে তাহাতে এই নারীগণের মহিমা জগতের নারীসমাজে বিশেষভাবে কীর্তিত হইবার যোগ্য। এই বিষয়ে উদাহরণের অভাব নাই। চাঁদবিনোদ ও মলুয়া, জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি কত গল্পের উদাহরণ দিব? বহুবিবাহের প্রতি বাঙ্গালি যুবকের আকর্ষণ এই গল্পগুলিতে সূচিত হইতেছে। কঙ্ক ও লীলার গল্পে কঙ্ক যেভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহা লইয়া ড. সেন অনেক কিছু কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই গল্পের সামাজিক অত্যাচারের বিবরণ সম্বন্ধে তো তিনি নীরব দেখিতেছি। কাঞ্চনমালা গীতিকা ও এতদ্দেশে প্রচলিত মালঞ্চমালার গল্পে যে শিশু-স্বামীর কথা পাওয়া যায়, তাহাতে কী বল্লালী কৌলীন্যের ফলে সামাজিক অবস্থার ছায়াপাত হয় নাই? ভেলুয়া গীতিকাতে ভেলুয়ার বিবাহ ব্যাপারে সামাজিক শিথিলতার লক্ষণ থাকিলেও ভেলুয়ার পিতার কৌলীন্যগর্বের কথাও আছে। এই সব গল্প গোঁড়া হিন্দুসমাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আর একটি কথা এইস্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ড. সেনের মতানুবর্তী হইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, এই যে প্রেমিক-প্রেমিকার সমাজকে ভয় না করিয়া প্রেমের জন্য সর্বস্ব বলিদানের প্রবৃত্তি—ইহার মধ্যে বৈষ্ণব সমাজের কিছু ছাপ থাকা সম্ভব কী? বৈষ্ণবদিগের সহজিয়া সম্প্রদায়, পরকীয়া ভাব, চণ্ডীদাস ও রামীর প্রচলিত জীবন কাহিনি এই গীতিকাসমূহের প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে প্রেমের জন্য সর্বত্যাগী হওয়ার সাহস জোগায় নাইতো? আবার রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি বর্ণিত কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় রাজা হওয়ার ব্যাপার অর্থাৎ কীর্তন গায়কের "মাথুরের" কিছু কিছু ছায়া এই গীতিকাগুলিতে বিবৃত নায়ক কর্তৃক নায়িকার ত্যাগের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া ভাবিতে পারা যায় কি?

গীতিকার নারী চরিত্রের দিক দিয়া একটা লক্ষ করিবার বিষয় আছে। সংস্কার-যুগের পূর্বে সম্ভবত হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে বাঙ্গালী নারী কর্মপ্রবণা ও বীরাঙ্গনা ছিল। মঙ্গল কাব্যগুলিতে তাহার বহু নির্দশন আছে। সংস্কার-যুগে অনুবাদ গ্রন্থসমূহের প্রভাবে সীতা-সাবিত্রীর অন্তরালে লখা-বেহুলা ম্লান হইয়া গেলেও মঙ্গলকাব্যগুলিতে এইসব নারী বরাবর যেভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে ইহাদের গুণরাশি অটুটই রহিয়া গিয়াছে। গীতিকাবর্ণিত নারীদিগের সহিত মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নারীদিগের এই হিসেবে কতকটা মিল দেখা যায়। গীতিকাসমূহের মহুয়া, মলুয়া, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি রমণীর তেজস্বিতা ও চিত্তের দৃঢ়তা লখা ও বেহুলার অনুরূপ দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই যেন এক ছাঁচে ঢালা। কথাসাহিত্যের মালঞ্চমালাকেও একই শ্রেণিভুক্ত করা যাইতে পারে। কিছুটা বৌদ্ধ ও কিছুটা হিন্দু কর্মবাদ এই চিত্তের দৃঢ়তার মূলে নিহিত আছে কি না কে বলিবে?

বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত এই গীতিকাসমূহের মাধুর্যের দিক দিয়া বেশ ঐক্য আছে। দুইই প্রেম বিষয়ক এবং মর্মস্পর্শী। তবে একটি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া লিখিত, অপরটি জাগতিক প্রেমকাহিনিতে পূর্ণ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম মানুষী

প্রেম নহে বলিয়া গীতিকাসমূহের বর্ণিত প্রেমকাহিনির ন্যায় আমাদের চিত্তকে তত অভিভূত করিতে পারে না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ও দেবতার লীলাকাহিনি, সুতরাং উচ্চতর স্তরের সন্দেহ নাই ; কিন্তু সুখ-দুঃখে পূর্ণ মানুষী-প্রেম এবং প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ আমাদের হৃদয়কে ঘনিষ্ঠতর ভাবে স্পর্শ করে। এই হিসাবে গীতিকাগুলি বাঙ্গালি জাতির অতি প্রিয়বস্তু। ড. সেন বৈষ্ণব পদাবলী ও গীতিকাসমূহের কোনো কোনো ছত্রে বেশ মিল দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার নিজের ভাষায়,[৫]

১. "বৈষ্ণব কবি ও কৃষক কবি, কেহ কাহারও নিকট ঋণী নহেন। ইঁহাদের উভয়েই বাঙ্গালাদেশের ভাবখনির সন্ধান পাইয়াছিলেন; দেহভাব-মূলক যে সব চলিত-কথা দেশময় প্রচলিত ছিল, সহজিয়ারা যাহা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই চলিত-কথার ঋণ বৈষ্ণব কবি এবং কৃষক কবি উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বৈষ্ণব কবিদের অপূর্ব পদের সন্ধান এই সকল কৃষক কবি জানিতেন, তবে তাহাদের ভাষা কিছুতেই এত অমার্জিত এবং প্রাকৃত-প্রধান থাকিতে পারিত না।"

২. পূর্ববঙ্গগীতিকার ভূমিকায় বৈষ্ণবপদকর্তাগণের পদের ও গীতিকা-রচকগণের ছড়ার অনেকস্থলে যে সাদৃশ্য আছে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহাতে ভূমিকা-লেখক পদকর্তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও লোচনদাসের পদসমূহ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া ধোপার পাট, ভেলুয়া, দেওয়ান ভাবনা, ঈশা খাঁ, মহুয়া ও কমলার নানা ছত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন ও সাদৃশ্য দেখাইয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এমনকি অপরাপর প্রাচীন সাহিত্যের সহিতও গীতিকাগুলির স্থানে স্থানে যে ভাব এবং ভাষার মিল আছে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি ডাকের বচন, ময়নামতীর গান ও কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের নাম করিয়াছেন।

এখন একটি প্রশ্ন মনে জাগিতেছে। সত্যই কি কৃষক কবি বৈষ্ণব কবির নিকট ঋণী নহেন? "এই পল্লীগীতিকাগুলি পড়িলে দেখা যাইবে, বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব ইহাতে এক ফোঁটাও নাই। গীতিকাগুলির ভাষা অমার্জিত, বৈষ্ণবকবির ভাষা মার্জিত। গীতিকাগুলির প্রেম কথার মধ্যে মধ্যে একটা উচ্চ রাজ্যের আভাস ইঙ্গিত আছে সত্য, কিন্তু তাহারা আধ্যাত্মিকতার ধার একেবারেই ধারে না। এগুলি গ্রাম্য প্রেমিক-প্রেমিকার কথায় পূর্ণ— রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করাইবার মতো তাহাদের মধ্যে কিছুই নাই। কোনো কোনো গীতি চণ্ডীদাসের পূর্বে বিরচিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশই পরবর্তীকালের। এই পালাগান-রচকেরা বৈষ্ণব কবিদের কোনো সন্ধান রাখিতেন না। তাঁহারা নায়ক নায়িকার প্রেমে মস্‌গুল হইয়া পালা রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্মের ধার তাঁহারা ধারেন না। তথাপি বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে অনেক সময় ছত্রে ছত্রে ইহাদের অতীব বিস্ময়কর মিল দৃষ্ট হয়।"

এই বিষয়ে আমাদের ধারণা কী তাহা নিম্নে লিখিতেছি। বৈষ্ণব কবি ও কৃষক

কবি উভয়েই যদি কোনো মূল উৎসের খোঁজ পাইয়া থাকেন ভালো কথা। ড. সেন প্রাচীন সাহিত্যে তাহার উদাহরণ খুব বেশি দেখাইতে পারিতেছেন না। কিন্তু কৃষক কবি বৈষ্ণব কবির নিকট বরং ঋণী—কিন্তু বৈষ্ণব কবি কৃষক কবির নিকট যে ঋণী নহেন এমন অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ময়মনসিংহের পূর্বসীমার মেঘনা নদ পার হইয়া চৈতন্যদেবের জন্মভূমি শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব-ময়মনসিংহ বাঙ্গালাদেশের অপরাপর অংশেরই ন্যায় এই চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। সহজিয়াগণ আরও পূর্বকাল হইতে সাধনার দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই চলিত কথার ঋণ কৃষক কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহাদের ও বৈষ্ণব কবিদের সকলেরই একটি মূল উৎস ছিল। তাহার পর ভূমিকাতে আছে "কোন কোনও গীতি চণ্ডীদাসেরও পূর্বে বিরচিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশই পরবর্তীকালের "অর্থাৎ ১৫শ কি ১৬শ শতাব্দী ও তৎপরর্তী কালের রচনা।"

চণ্ডীদাস এক নাকি বহু ছিলেন, সেই তর্কের গহন বনে এখন প্রবেশ নাই করিলাম। তাহা হইলে দেখিতেছি, সম্পূর্ণ বৈষ্ণব প্রভাবকালে এই ছড়াগুলি রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে বৈষ্ণব কবিগণের সঙ্গে এই কৃষক কবিগণের অনুকরণ কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, বরং উল্টো মনে হয়। কৃষক কবিগণ মূল উৎস হইতে কতটা ধার করিয়াছেন জানি না, কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের অনেক পদ যাহা ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা হইতে কিছুটা নিয়াছেন বলিয়া ধারণা করিলে অন্যায় হয় না। উভয়ের মূল কতকটা এক থাকিতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কল্পনা করিলে ইহার নিকট হইতে কৃষক কবির কিছু ঋণ নেওয়া অসম্ভব কি? গীতিকাগুলির ভাষা মার্জিত না হইতে পারে বা রাধা-কৃষ্ণের কথা না থাকিতে পারে কিন্তু বৈষ্ণবদিগের কতকগুলি প্রচলিত বচন তাহারা অমার্জিতভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাতে আপত্তি কী হইতে পারে? রাধা-কানুর বিষয় ও পালাগানগুলির বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র, সুতরাং রাধা-কৃষ্ণের কথা পালাগানে থাকিতে পারে না।

মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায় আছে "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং বিজয় এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী দুই তিন শতাব্দী কাল" (?) পূর্ব-ময়মনসিংহ সেনবংশীয় রাজাগণের রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল পালাগানগুলিতে তাহার প্রভাব রহিয়াছে। পূর্ব-ময়মনসিংহ রঘুনন্দনকে স্বীকার করে নাই, এই হেতু পালাগানোক্ত প্রধান চরিত্রগুলি সেনবংশ-প্রতিষ্ঠিত ও রঘুনন্দন-শাসিত হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। এই কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইলে পালাগানগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীন, অন্তত সেই পালাগানগুলির অধিকাংশ এই সময়েরই রচনা। আমরা ইহাই বুঝিতেছি। আবার তিনি বলিতেছেন, "কোন কোন গীতি চণ্ডীদাসের পূর্বে বিরচিত হইয়া থাকিবে কিন্তু অধিকাংশ পরবর্তী কালের।" এই উক্তিটিও ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা কীরূপ হইল? ড. সেনের শেষোক্ত কথা মানিতে হইলে ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে পালাগানের যুগ

ধরিতে হয়। হয় মানিতে হয় গীতিকাগুলির সময় ১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে অথবা মানিতে হয় ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে ইহাদের রচনাকাল। কোন্ কথাটা মানিব? যাহা হউক, সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ধরিয়া লইলাম যে, ড. সেনের অভিমত ১০ম হইতে তৎপরবর্তী কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ এতগুলি শতাব্দী অনুমান করার অর্থ এই যে গীতিকাগুলির সময় নির্ধারণ ড. সেন স্পষ্টভাবে করিতে পারেন নাই। আমাদের কিন্তু একটা কথা মনে হয়। অল্প কয়েকটি গীতিকার বিষয়বস্তু পুরাতন এমনকী পালরাজাদিগের আমলের গোবিন্দচন্দ্রের গীতের সমসাময়িক হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ পালাগান (যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে) তত পুরাতন নহে এবং রচনা ১৮শ/১৯শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। কোনো আধুনিক গ্রাম্য কবি যদি ইচ্ছা করেন তবে এইরূপ কবিতা এখনও লিখিতে পারেন। শব্দ-সম্ভার ও রচনাভঙ্গী প্রাচীন ছাঁচে ফেলিয়া লেখা আধুনিক গ্রাম্য কবির পক্ষে তত কঠিন নহে। বিষয়বস্তু ও স্থানীয় ব্যবহৃত শব্দগুলি এই বিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। তবে রচনাভঙ্গী প্রাচীন আদর্শে করিতে গেলেও আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন গ্রাম্য কবির প্রচেষ্টা তাহাতে সম্পূর্ণ সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ, গাছপালা ও গ্রাম্যদৃশ্যের বর্ণনাগুলিতে যথেষ্ট আছে। ১০০/২০০ শত বৎসরের প্রাচীন ছড়াগুলিই বোধ হয় বেশি। ৩০০/৪০০ শত বৎসরের প্রাচীন ছড়া বোধ হয় খুব অল্প। বিষয়বস্তু এই বিষয়ে আমাদিগকে কতকটা সাহায্য করিতে পারে। ৪০০ শত বৎসরের পূর্বেকার ছড়া কোনো কোনোটি থাকিতে পারে, তবে তাহা ধরা কঠিন। শুধু ভাষা দ্বারা যে উহা ধরা অসম্ভব ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অনেক প্রাচীন শব্দের এখনও প্রচলন আছে, আবার অনেক বৈদেশিক শব্দেরও বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে এবং স্থানীয় শব্দ ব্যবহারের ত কথাই নাই। আধুনিক অর্থাৎ বর্তমান কবিগণের আংশিক বা সম্পূর্ণ হস্তচিহ্ন কোনো কোনো পালাগানে যে নাই তাহাই বা কে বলিবে?

ভাবের দিক দিয়া পালাগানগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা ভালোই হইয়াছে। আমরা পালাগানগুলিকে ইতিহাস-প্রধান ও ইতিহাস-অপ্রধান গীতিকাতে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করি। ইতিহাস-প্রধান পালাগানে মুসলমান আধিপত্যের উদাহরণ সূচিত হইতেছে। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক হইতে ধরিয়া লইলে এইগুলির রচনার সময় মোটামুটি বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। অনৈতিহাসিক পালাগুলিতে এই সুবিধা নাই। যাহা হউক ইতিহাসের অনেক অমূল্য তথ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গীতিকাসমূহের অনেকগুলিতে পাওয়া যায়। এই গীতিকাগুলিতে দেশ ও সমাজের ছবি অতি সুস্পষ্টভাবে বর্তমান আছে এবং মুসলমান দেওয়ান, কাজি, কারকুন, সিন্দুকি প্রভৃতির অত্যাচার কাহিনি জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কবিত্ব, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেশ-ভূষা প্রভৃতি নানারূপ তথ্যের দিক দিয়া গীতিকাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। ভাষার দিক দিয়াও গীতিকাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নানা কারণে এই গীতিকাগুলির বহুল প্রচার

বাঞ্ছনীয়। অনাবিষ্কৃত গীতিকাগুলিও যাহাতে আমাদের চক্ষে পড়ে তাহার জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত।

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গেই এই গীতিকাগুলি প্রধানত পাওয়া যাইতেছে। উত্তর-বঙ্গেও পালাগান পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে এইগুলি বাহির করা হইতেছে না কেন? কেহ কেহ বলেন, মধ্যযুগে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গোলযোগ সর্বদা বেশি হওয়াতে পালাগানগুলি এই অঞ্চল হইতে লোপ পাইয়াছে। এই কথার সত্যতা কতদূর জানি না। মুসলমানগণ পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গেই অধিক এবং ইহাদের আগমনে রাজনৈতিক আবর্তন পূর্ববঙ্গেও তো কম হয় নাই। আমাদের মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে পালাগান বাহির করিবার সম্যক্ প্রচেষ্টা এখনও হয় নাই। উহা হইলে পরে এই বিষয়ের মতামত দেওয়া সমীচীন হইবে।

গীতিকা-সাহিত্য সম্বন্ধে য়ুরোপের ন্যায় আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই কল্যাণের কথা।

তথ্যের সন্ধানে

১. মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৬—৮, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১০, ৮৯ ও ৯৩ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. V. Smith's Early History of India, 4th ed., p. 414, R. D. Banerjee's The Palas of Bengal, P.100 এবং বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

৩. মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪. পালাগান অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। ১১-১২শ শতাব্দীর গোপীচন্দ্রের গীত একটি পালাগান। পালাগানগুলি ধর্মমূলক নহে। মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার পালাগানগুলি গোপীচন্দ্রের গীতের সহিত আমরা একশ্রেণিভুক্ত করিতে পারি। তবে উভয়ের তফাৎ মূলত সময়ঘটিত। শেযোক্ত গীতিকাগুলি (মৈ. গী. ও পূ.ব. গী.) যে অনেক পরে রচিত হইয়াছিল তাহা আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

৫. ক) ভূমিকা, ধোপার পাট, পূর্ববঙ্গগীতিকা, পৃ. ১০

খ) ভূমিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯-৯৩

মৈমনসিংহ গীতিকা

মুহম্মদ আবদুল হাই

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের কথাও আজ নূতন করে ভাবতে হচ্ছে। নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে জাতির পরিচয় সূত্র গ্রথিত হয় তার শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যে। যুগ ও কালের স্রোতে জাতিরও রূপ বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রতি যুগে জাতি তার অপরিবর্তনীয় অর্ঘ্য রচনা করে যায় তার সাহিত্যে। মহান পাকিস্তানি জাতি নবতম সৃষ্টির বেদনায় স্বপ্ন দেখেছে তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও গৌরবদীপ্ত ভবিষ্যৎ রচনা করার জন্য। সত্য বটে, জাতির আজ নব জন্ম, কিন্তু যে ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো তারও বহুকালের একটা ভৌগোলিক সত্তা ও প্রাকৃতিক পরিচয় রয়েছে। ভৌগোলিক সত্তার দিক থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের মতো এত সুন্দর দেশ খুব কমই আছে। মাঠে ঘাটে, নদী নালায়, বনে বনে এদেশে শুধু সবুজের মেলা। রূপে রসে ভরপুর এদেশ। দোয়েল, শ্যামা, পাপিয়ার গান সন্ধ্যা ও সকালে এদেশের মানুষের প্রাণে অপূর্ব উন্মাদনা এনে দেয়। শস্য-শ্যামল মাঠের উপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে যায়—দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে আসে। কবি না হলেও এখানকার মানুষ প্রাকৃতিক সোনালি শোভায়, কুহেলীঘন মায়ার পরশে স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের দিক থেকে এদেশের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গাঁথা। শুধু নূতন পারিপার্শ্বিকতায় পরিবর্তিত হচ্ছে এখানকার মানুষের জীবনাদর্শ।

ভবিষ্যৎ আমাদের আশাপ্রদ। ইসলামের সুমহান প্রেরণায় পূর্ব-পাকিস্তানিদেরও জীবন গড়ে উঠবে, রচিত হবে তার সাহিত্যের ইমারত। এ প্রসঙ্গে অতীতকেও আমাদের স্মরণ করতে হবে; কেন না অতীতের রচিত সাহিত্যে এ দেশের প্রকৃতিও মানুষের জীবন অদ্ভুতভাবে রূপায়িত হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার দিক থেকে যেমন পূর্ববঙ্গের তফাৎ তেমনি বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলাগুলির মধ্যেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এদিক থেকে খাস পূর্ব-বঙ্গের মৈমনসিং, সিলেট ও চাটগাঁর বৈশিষ্ট্য অনেক খানি। এই বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এখানকার গীতিকা তথা সাহিত্য।

পূর্ব-পাকিস্তানের মৈমনসিং জেলা প্রকৃতির লীলা নিকেতন। উত্তরে আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্বত। পূর্বে পর্বত-সংকুল আসাম প্রদেশ। তারই পার্শ্বে মৈমনসিং জেলার নিম্নভূমি অবস্থিত। অসংখ্য নদ-নদী ও ঘনবন সমাকুল এ জেলাটি। ধনু, কুলেশ্বরী, কংস রাজেশ্বরী, ঘোড়া, উৎরা, সুন্ধা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র এ জেলারই উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে আবার খাল বিল ও তড়াগ। এগুলিকে মৈমনসিং-এর গ্রাম্য পরিভাষায় 'হাওর' বলা হয়।

প্রাক্-পাকিস্তান যুগের ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলারও সভ্যতা ছিল গ্রামীণ। সুতরাং বলা বাহুল্য আজিকার পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের জীবনও গ্রাম-নির্ভর। এখানকার অন্যান্য জেলার মতো মৈমনসিং জেলারও জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। পাকিস্তানের স্বর্ণতন্তু পাট বহুকাল থেকেই এ জেলার বৃহত্তম সম্পদ। ধান এখানে মন্দ হয় না। বীজ ছড়ালে এ জেলার মাটিতে সোনা ফলে। তবু জীবন এখানে অনায়াসলভ্য নয়। নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল-তড়াগ তথা 'হাওর' এবং বর্ষা বাদলার জন্য এখানকার অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। জেলা ও মহকুমা শহরগুলোকে বাদ দিয়ে বাকি গ্রাম্য মানুষেরা সাহসী, সহিষ্ণু এবং পরিশ্রমশীল। এখানকার পল্লি জীবনের মধ্যে পাওয়া যায় একটা লঘু স্বচ্ছ আনন্দ-বেগ। সংসার জীবনের রূপ বাস্তবতার মধ্যেও পল্লির শ্যামল শোভা তার অধিবাসীদের চোখে নীলাঞ্জন বিস্তার করে দিয়ে যায়। তাই এখানকার নরনারীর জীবনে রোমান্স হয় সহজে। প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ কিংবা ভীমকান্ত রূপের মোহ নিজেদের জীবনে এরা উপলব্ধি করে। জীবনের এরূপ, নরনারীর এমন আনন্দাভিসার, জীবনকে জয় করার দুর্জয় সাহস আবার যুগান্তকাল প্রবাহিত সমাজ সংস্কারের কাছেও আত্মবলিদান, স্বাধীন প্রেম, প্রাণমনের বাসনা কামনার প্রতি সস্নেহ শ্রদ্ধা এবং সমাজ আদর্শের কাছে নুয়ে পড়া—মানব মনের এই সুন্দর ও সুকোমল বৃত্তিগুলোর অপরূপ বিকাশ হয়েছে প্রকৃতির লীলাভূমি মৈমনসিংহ জেলার পল্লিবাসী মানুষের জীবনে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলার মানুষের জীবন এমন সুচারুরূপে আর কোথাও রূপায়িত হয়নি। ইউরোপের সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশ তার সাহিত্যে আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ও নূতন ক্ষমতাবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশ্বের বিরাট জীবন ধারার সাক্ষাৎ আমরা পাচ্ছি কিন্তু বৃটিশ-পূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্য যখন ধর্ম ও দেব-দেবীর প্রভাবে ভারগ্রস্থ, সেকালে পূর্ব-বাংলার পল্লিজীবন বহুকালব্যাপী আপনাকে আপনি রচনা করে গেছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও সাম্প্রদায়িক বিষ জর্জরিত বর্তমান কালের বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের কাছে এ সব আজ রূপকথা ও স্বপ্নের মতো শোনাবে; কিন্তু সাহিত্য যদি জাতি ও যুগ-জীবনের দর্পণ স্বরূপ বিবেচিত হয় তাহলে একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য কবি রচিত মৈমনসিংহ গীতিকায় সেকালের মৈমনসিংহের জীবনের যথার্থ ছবি আমরা পাই।

মুস্‌লিম শাসনের পূর্বকাল থেকে মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি সেখানে বিভিন্ন ভাবে

প্রচলিত ছিল, কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকেই এগুলো পালা আকারে গীত হতে থাকে। চন্দ্রকুমার দে এ পালাগুলো মৈমনসিংহের নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেন এবং দীনেশচন্দ্র সেন এ শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকে এগুলির সম্পাদনা করেন।

মৈমনসিংহ গীতিকা নামে যতগুলি পালা প্রচলিত আছে তার মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দেওয়ান ভাবনা, ফিরোজ খাঁর পালা ও দেওয়ানা মদিনা প্রধান। এর মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী ও দেওয়ানা মদিনা দুঃসাহসিকতায় এবং রোমান্সে পরিপূর্ণ। আত্মত্যাগও প্রেমের মহিমা ঘোষণায় কিংবা সমাজের বেদীতে জীবন বিসর্জনে বেদনা-করুণ। হোমরা বেদে কর্তৃক অপহৃত ব্রাহ্মণ মেয়ে মহুয়া ছেলেবেলা থেকে হোমরাকে পিতা বলে জানে। যৌবনে বেদের দলে নাচ গান করতে গিয়ে নদের চাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নদের চাঁদ ও মহুয়ার পারস্পরিক আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠে। হোমরা বেদের অজ্ঞাতে উভয়ে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। হোমরার দলের মধ্যে থেকে মহুয়া তার প্রিয়জনের সহিত মিলিত হয় অত্যন্ত সন্তর্পণে। হোমরা পরে তাকে ধরে ফেলে এবং তার হাতে বিষাক্ত ছুরি দিয়ে নদের চাঁদকে হত্যা করতে বলে; তাতে মহুয়াকে বলতে শুনি—

> কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
> খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি॥

মহুয়া আত্মত্যাগ করলো; হোমরা বেদেরা নদের চাঁদকে প্রাণে মারলো। পালিতা কন্যাকে এমন ভাবে হারিয়ে হোমরার চেতনা ফিরে এলো। শোকে অধীর হয়ে সে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করলো।

চন্দ্রাবতীর পালায় চন্দ্রার প্রিয়জন জয়চন্দ্র বিজাতীয় নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে পিতার আদেশে চন্দ্রার যে কঠিন ত্যাগ ও সাধনা দেখি, তার তুলনা তখনকার দিনে বড় বেশি পাওয়া যায় না—

> যোগাসনে বসে কন্যা নয়ন মুদিয়া।
> একমনে করে পূজা ফুল বিল্ব দিয়া॥...
> কিসের সংসার কিসের বাস কেবা পিতা মাতা।
> পূজিতে ভুলিল কন্যা শৈশবের কথা॥...

নূতনের মোহমুগ্ধ জয়চাঁদ অনুতাপের অনলে পরিতপ্ত হয়ে ফিরে এসে মন্দিররুদ্ধা চন্দ্রাকে লক্ষ্য করে বন্দনা আরম্ভ করলো—

> দেব পূজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গার পানি।
> আমি যদি ছুই কন্যা হইবা পাতকিনী॥
> নয়নভরে দেখ্যা যাই জন্মশোধ দেখা।
> শৈশবের নয়ান দেখি নয়ান ভঙ্গি বাঁকা॥

এতেও—

না খোলে মন্দিরের দ্বার মুখে নাহি বাণী।
ভিতরে আছয়ে কন্যা যৌবনে যোগিনী॥

দেওয়ানা মদিনা পালাটিতেও শোকের এই অশ্রুনির্ঝর। আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের মোহমুগ্ধ দ্বিতীয় বার পরিণীত দুলালকে শেষ পর্যন্ত তার প্রথম স্ত্রীর জন্য অনুতাপে বিশুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখি। তার এ চেতনা যখন হল তখন মদিনার সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে।

পল্লিজীবনের হিন্দু-মুসলিম বাঙালির ছোটো ব্যথা ও ছোটো ছোটো দুঃখ-কথা মৈমনসিংহ গীতিকার এই পালাগুলোতে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নর-নারীর প্রেমময় আন্তরিকতা ও ত্যাগ-কঠিন সাধনা তাদেরকে মর্ত্য জীবনের আনন্দ ও বেদনায় অভিষিক্ত করে দিয়ে গেছে।

এ ছাড়া, এ পালাগুলোতে সে কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক জীবনেরও রেখাপাত হয়েছে। সুতরাং এদেশের পূর্ণ ইতিহাস রচনার দিক থেকে মৈমনসিংহ গীতিকার মূল্য অপরিসীম।